হাতিয়ার থেকে যন্ত্র

সাধন দাশগুপ্ত

প্রশ্ন প্রকাশন

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র

সাধন দাশগুপ্তের

প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ইতিহাস

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র

ঈস্টার্ন বুক এজেন্সি

৮সি টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ইতিহাস

HATHIAR THEKE jANTRA

BEGINING OF ENGINEERING SCIENCE

UPTO 1600 AD.

লেখক : সাধন দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : বিশ্বকর্মাপূজা ১৯৯০

প্রচ্ছদ দিলীপ দাস

অন্যান্য ছবি সোমনাথ রায়চৌধুরী

মূল্য : ১২.০০ টাকা

শ্রীমতী নীহারকণা বন্দ্যোপাধ্যায়

[ঈস্টার্ন বুক এজেন্সি কলিকাতা-৯] কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্টার প্রিন্টিং প্রেসের পক্ষে শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল [একুশের এ, রাধানাথ বোস লেন, কলিকাতা সাত লক্ষ ছয়] কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

[১]

বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখার সূচনাতে 'ফিনিক্সের নবজন্মের' আবির্ভাব। আর তারই পরিপূরক-সম্পূরক হিসেবে লেখা হলো "হাতিয়ার থেকে যন্ত্র"। ফিনিক্সের নবজন্মে ছিল মানুষের কথা—তার সংস্কৃতি-শিক্ষা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আর ছিল মানুষের দৈত্য হয়ে ওঠার গল্প। এখানে রইল মানুষের যন্ত্রণার কথা—পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে মানুষের জয়ের সাধনা—যেখানে দেখা দিল তার হাতিয়ার—হাতের বা মনের। তার যন্ত্র এবং তার ভাষা।

দুটি বই একসূতোয় গাঁথা—দুটিতে রইল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মানুষের বিজ্ঞান সাধনা। আর তারপর নিউটনের যুগ। তবে সে অন্য গল্প!

[২]

নব বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি প্রথম জানা যায় পল এরনফেস্ট-এলবার্ট আইনস্টাইনের কাছ থেকে।...ধরা যাক, এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে একটি পটভূমি—স্থান হল্যাণ্ডের লেইডনের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের বাড়ি; কুশীলব তিনজন—গৃহকর্তা আর তাঁর বন্ধু এবং গৃহকর্ত্রী। গৃহকর্তা মনে করেন, প্রচলিত ধর্মের স্থান নেবে বিজ্ঞান। কারণ বন্ধুর আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশের ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বর্গ-ঈশ্বরের ধারণায় চিড় খেয়েছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বহুল প্রয়োগে সেদিনের মেনে নেয়া অনেক ধারণার ভাঙচুড় ঘটেছে। গৃহকর্তা পল এরনফেস্ট মনে করেন—বিজ্ঞান হলো কৌতূহল—যে কৌতুহলে মানুষ নিজেকে জানতে চায়, পারিপার্শ্বিকটিকে বুঝতে চায়। এই চাওয়ার জন্য সে নিজেকে বিস্তৃত করে, শক্তিশালী করে। সে যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নেয়—তাকে ঝাড়াই বাছাই করে, সাজিয়ে গুছিয়ে গোলাজাত করে। বিজ্ঞান হলো সংস্কৃতির হাতিয়ার।

বন্ধু এলবার্ট আইনস্টাইনের এই ব্যাখ্যাতে আপত্তি নেই। তবু তিনি ভাবেন,—নিছক কৌতুহলে মানুষ বিজ্ঞানী হয় না—বিজ্ঞান চর্চা, সংস্কৃতির চর্চা করে না। এখানে থাকে ভালবাসা। তিনি বলেন, মাদাম কুরীর কথা—যে মহিলাটি পিয়ের কুরীর ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছেন বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান তাই যৌবনের ভালবাসা এবং যৌবনের আগলভাঙা উচ্ছ্বাসের জোয়ার। শুধু এই জোয়ারটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সেখানেই থাকে মানুষের যন্ত্রণা।

গৃহকর্ত্রী তাতিয়ানা এরনফেস্ট দুই বন্ধুর এই আলোচনার স্মৃতিচারণ করেছেন।

তিনি বলেছেন—এই বিজ্ঞান যেন সখ্যতা—যা কৌতূহল ভালবাসা দিয়ে ঘেরা, সমঝোতার স্থত্রে গাঁথা।

—না, তাতিয়ানা সেদিনের গল্পগাথাটি বিশদ করে বলেননি। টুকরো টুকরো কথার ছলে তাঁদের আলোচনাটি লিখেছেন। বড় সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট সেই দিনের কথা। তবু দুটি বন্ধুর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার ইতিবৃত্ত সেখানে ধরা দেয়। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট—তবু কত যে ইঙ্গিতবহ।—আর জানান, দুটি বন্ধুই বিজ্ঞানের আলোচনার শেষে মানুষকে নিয়ে ভাবতেন—কারণ মানুষই বিজ্ঞান চর্চা করে, জানতে চায়, জানাতেও চায়। সু অথবা কু—সব কাজের কেন্দ্রে আছে মানুষ।

একটি গল্প শ্রোয়েডিঙ্গার বলতেন। পারসীদের প্রাচীন গাথা থেকে নেয়া। আহুর আহুজা তৈরি করলেন সুন্দর সুস্থ প্রকৃতি-প্রাণিজগৎ আর তার শত্রু এবং ভাই আহুর মাজদা গড়লেন কুশ্রী অসুস্থ পরিবেশ, রোগ-শোক-ঘৃণা-হিংসা-হত্যা। দুটিই নিল মানুষ। কখনো আহুর আহুজা জয়ী হন। আবার কখনো আহুর মাজদা। ··মানুষকে কি চেনা যায়?

—আইনস্টাইনও বললেন, 'প্রকৃতির কিছু কিছু চিনি, মানুষের কিছু চিনি না।'

—অথচ মানুষকে না জানলে, তার বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তকে না বুঝলে সংস্কৃতিকে যে চেনা যায় না! আর সংস্কৃতির প্রবাহে থাকে ইতিহাস পুরুষ দানব-মানুষরা। এরনফেস্ট বললেন, জায়েণ্টদের বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না—তা প্রচলিত ইতিহাস হোক, অথবা হোক বিজ্ঞানের ইতিহাস।

আইনস্টাইন বললেন, জায়েণ্টরাই হাতিয়ার খোঁজে—খোঁজে প্রকৃতিকে চিনতে, জানতে। সেই হাতিয়ার বাস্তব, অথবা তা তত্ত্বের।—হাতিয়ারই মানুষকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়—নিয়ে যায় অগ্রগতির পথে, প্রগতির রথে।

[৩]

ফিনিক্সের নবজন্ম, হাতিয়ার থেকে যন্ত্র ও থালীসের গাথা—তিনটি বইয়ে এরনফেস্ট-আইনস্টাইনের চোখ দিয়ে বিজ্ঞানকে দেখার চেষ্টা। তাঁদের জালানো আলো দিয়ে—একটি ছোট প্রদীপ জালাবার আকাঙ্ক্ষা।

পুরনো দিনের ইতিবৃত্তের ছোঁয়ায় এলবার্ট আইনস্টাইনের চিন্তাকে বোঝা কি যায়?

কলিকাতা

লেখক

সূচী

এই লেখকের অন্যান্য বই

আলো আরও আলো

রোমাঞ্চকর রসায়ন

এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ

ভাষাগণিত

মির্জা গালিব

ফিনিক্সের নবজন্ম

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র

থালীসের গাধা

(১) গল্প হলো শুরু ....

হাতিয়ার নিয়ে মানুষ কখন কাজকর্মে নেমে এল, তার হদিশ ইতিকথা ইতিহাসে নেই। কিছু আছে গুহাচিত্রের অঙ্কনে, ফসিলে, লুকোনো গুহায় পাওয়া পত্র-পুঁথিতে, মাটির গহ্বরে। এসব জিনিস নিয়ে আজকের মানুষ প্রথম দিনের মানুষের কথা ভাবতে বসেন ; দেখা যায়, সে সব দিন অন্ধকারে ভরা, একটা দুটো তারার আলোর ঝিকিমিকি আছে অবশ্য ; তাতে পথ দেখা যায় না। তবু বিজ্ঞানীরা মানুষের বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটা দিনপঞ্জি তৈরি করেন।

এক বিশাল সময় গেছে, যেদিন আদিম মানুষ ছোটখাট পাথর, কাঠ নিয়ে পরীক্ষা করে অথবা একসিডেণ্টেই হাতিয়ার-হেতের পেল। অভিজ্ঞতার পথে ব্যবহারিক নিয়ম জানলো, সেই নিয়ম আর হাতিয়ার এক মানুষের কাল থেকে অন্য মানুষের কালে স্মৃতি আর শ্রুতির পথে বয়ে গেল। তারপর অবশ্য হরফ আবিষ্কারের পর অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে কালজয়ী করা গেল। ইতিমধ্যে মানুষ কাপড় বুনেছে, মাটির বাসন গড়েছে, চকমকি পাথরের ব্যবহার শিখেছে, পাথর দিয়ে বাসন, এমন কি ধাতুর ব্যবহার—তাও গড়ে উঠেছে। অথচ তখনো যা হেতের বা হাতিয়ার, তা সামান্য আর অসম্পূর্ণ ; তবু তাই দিয়ে তারা পিরামিড গড়লো, নীল নদীর ধারে বাঁধ বানলো, ব্যাবিলনের ঝোলানো বাগান বানালো, তৈরি করল নৌকো, পালতোলা জাহাজ এবং নগর। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এসব কাজ যখন হচ্ছে, তখন চাকার ব্যবহার সর্বত্র হয়নি। অন্তত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পিরামিড গড়ার সময় চাকা ছিল না। আসীরিয়ানদের প্রাচীন চামড়ার যে পুঁথি পাওয়া গেছে, সেখানে জানানো হয়েছে—বড় বড় কাঠের গোল গোল গুঁড়ির উপর কাঠের তৈরি বাক্স জাতীয় অথবা চৌকি জাতীয় বস্তুর উপরে ভার চাপিয়ে লাঠি দিয়ে, দড়ি দিয়ে টেনে, তারা মালপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত—গরুঘোড়ার ব্যবহার নেই, ঠেলাঠুলি করত মানুষ। আর, হয়তো তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ কালে মাটির বাসন গড়তে চরকি এল,

আর তার পথ ধরে এল চাকা—সে ঘটনা ঘটে ব্যাবিলনে। চাকা ঘোরার পথে তুম করে মানুষ লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের বিজ্ঞান চিন্তার ধারাটাকে কয়েকটা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। দশ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে চার হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হলো নানা অভিজ্ঞতার ফসল তোলা, ৪০০০ হাজার থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হলো নানা কলাকৌশল শেখা, প্রকৃতির রহস্যে মজে থাকা, নগর সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে সুরু হলো বিজ্ঞানচেতনা, যার আরম্ভ গ্রীসে। তবু হাতিয়ারকে যন্ত্র করে তুলে ধরা, আরো পরে, ধরা যায় ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে!

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র কি আলাদা? বিজ্ঞানীরা বলেছেন, হাঁ তফাত আছে। একটা হলো না জেনে,অশিক্ষিত পটুত্বের প্রকাশ। অন্যটা হলো, কেন এমন হলো, তার নিয়ম খুঁজে তাকে বোঝা, আর নিয়মের বিস্তৃতি ঘটিয়ে নতুন হাতিয়ার গড়া, নতুন হাতিয়ারের সম্ভাবনার দ্বারে পৌঁছে যাওয়া। নিয়ম নিয়ে হাতিয়ার যন্ত্র হয়, যেমন সুর নিয়ে কথা গান হয়ে ওঠে। সেই গানের আবেদন বেশি, তা স্মৃতিতে ধরা পড়ে, থাকে অনেক দিন ধরে। আবার অনেকে বলেন,হাতিয়ারে কোনো গতিময় অংশ নেই, —যেমন লাঙল, কুড়োল ইত্যাদি। অন্যদিকে যন্ত্রের অংশে নিজস্ব গতি থাকতে পারে,—যেমন গরুর গাড়ি, কুমোরের চাক ইত্যাদি। তবে এ সংজ্ঞা খুব একটা গ্রহণীয় নয়।...এই যন্ত্র নিয়ে ভাবনা শুরু গ্রীসে হলেও, যন্ত্র এসেছে চীনে, ব্যাবিলনে, ভারতে বা অন্যত্র। পরে যন্ত্রযুগের বিরাট আবির্ভাব ঘটে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে। আজকের যে বিজ্ঞানভিত্তিক যান্ত্রিক সভ্যতা আমরা দেখছি, যার পরিমাপ করতে হিমসিম খাচ্ছি, তার সূচনা কিন্তু সেই ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীস বিজ্ঞানী আর্কিমীদিসের হাতে।

বিজ্ঞানীরা আর্কিমীদিস সম্পর্কে বলেছেন, তিনি হলেন এমন দর্শক যিনি, যখন দেখেন, তখন দেখাটাকে চোখের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন, জানতে চান কি দেখলেন, যা জানলেন তা থেকে কি বোঝা গেল আর যা বোঝা গেল তা কি জানায় নতুন কিছু? বড় বড় লাঠি দিয়ে মাল

নাড়ানো বা সরানো অনেক কাল থেকে ঘটে গেছে। সবাই দেখে, দেখেছে। আর্কিমীদিস কিন্তু সেই দেখাতেই থামলেন না। তিনি কেমন করে বড় ভার লাঠি দিয়ে নাড়ানো যায় তার নিয়ম বার করলেন—লিভারের নিয়ম। একটা ফালক্রামের তুপাশে ভিন্ন ওজন ঝুলিয়েও ব্যালেন্সের সমতা আসে—নির্ভর করে ফালক্রাম থেকে ওজন কত দূরে থাকে। আর সেই পথে বড় ওজনকে একটা লাঠি দিয়ে রোগাপাতলা লোক নাড়াতে পারে। আর্কিমীদিস লিভারের নিয়ম পেলেন আর লিভারের নিয়ম দিয়ে জাহাজের দাঁড় থেকে, জাহাজ নড়ানো পর্যন্ত সব কিছু সহজ করলেন। আর করলেন মেকানিকাল লিফ্‌ট্। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এখনো আদিবাসীরা গভীর কুয়ো থেকে যে জল তোলে, সেখানে তারা একটা বাঁশ বা কাঠের একপাশে বাঁধে বড় ওজন, অন্যপাশে দড়ি। দড়ি টেনে বালতি নামানো হয় নিচে আর জলভরা বালতি সহজে উপরে তোলা যায়, কারণ কাঠের অন্যপাশে থাকে ওজন। একে বলে ট্যাঁড়া-ডাঙ। এই পদ্ধতি আদিযুগে ছিল মিশরে, ব্যাবিলনে বা গ্রীসে। আর্কিমীদিস ট্যাঁড়াডাঙের নিয়মটাকে ওজন তোলাতে লাগালেন। একটা বড় লাঠির নিচে থাকল একটা চাকা, চাকায় লাগানো আছে দড়ি। আর দড়িটা লাঠির গা ধরে চলে গেছে অন্য মাথার উপরে—দড়ি যাবার পথে আছে ঘাট কাটা অনেক গোল চাকা যাকে বলা হবে পুলি। লাঠির শেষ মাথাতেও আছে পুলি—আর তার থেকে দড়ি ঝুলছে—সামনে বাঁধা হুক। বাস, হুকে ওজন ধরো বা বাঁধো ; আর নিচের বড় চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ি পাকিয়ে লাঠির মাথা অবধি উঁচুতে ওজন তুলতে পারা যায়। আর্কিমীদিস দেখলেন পুলির মধ্যে দড়ি নিয়ে যাওয়ায় দড়ি যেমন এলোমেলো হয় না, ওজন তোলাও সহজ নয়। কেন হয়—পুলির নিয়মটা,সেই ভাবনাটা আর্কিমীদিসের থাকলেও তার উত্তর তিনি খুঁজে পাননি। কারণ তখন তিনি তাঁর এইসব যন্ত্র নিয়ে রোমের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন। পুলির নিয়ম পাওয়া গেল আর কিছু পরে। তবে ইতিমধ্যে আর্কিমীদিস আরেকটা যন্ত্র করে ফেললেন।

চরকিতে মাটি যখন ঘোরে, তখন ছোট থেকে বৃত্ত বড় হয়, দড়ি যখন

এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়, সেখানেও বৃত্ত ছোট থেকে বড় হতে থাকে, মাকড়সার জালেও বৃত্ত পাক খেতে খেতে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই যে বৃত্তের পাক নিয়ে বড় হয়ে দাঁড়ানো—একে বলে স্পাইরেল। স্পাইরেলের ছকটিকে একটু আলগা করে নিলে যা পাওয়া যায় তাকে বলে হেলিক্স—যেমন ঘোরানো সিঁড়ি, অথবা স্ক্রুর নিচে যে খাঁজ কাটা দাগ। কুমোরের চরকি নিয়ে ভাবতে গিয়ে আর্কিমীদিস পেলেন স্পাইরেল তত্ত্ব, স্পাইরেল তৈরি করার নিয়ম আর জানলেন হেলিক্স কিভাবে করা যায়। বাস্; তারপর তিনি একটা সিলিণ্ডারের কেসে একটা স্পাইরেল স্ক্রুকে আঁটসাঁট করে ঢুকিয়ে তৈরি করলেন ওয়াটার পাম্প। তারপর আরো খেটে খুটে করলেন আরেকটা পাম্প—স্পাইরেল স্ক্রুয়ের বদলে রইল ফাঁপা হেলিকেল স্ক্রু—তার একদিক রয়েছে জলের মুখে—স্ক্রু ঘোরালে জল উপরে উঠে। আর্কিমীদিস যে পাম্প তৈরি করলেন, তার ব্যবহার অনেকদিন পর্যন্ত চলে এল। শাহজাহানের আমলে আওরঙ্গজেব যখন বিজাপুর গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন তখন সেখানে রাজপ্রাসাদে, দুর্গে এ ধরনের পাম্প ছিল—যে খবর ইতিহাসকাররা বলেছেন।

আর্কিমীদিসের পুলির নিয়ম দিলেন হিরো। তিনি যে ঠিক কবে আলেকজান্দ্রিয়াতে ছিলেন জানা যায় না। কেউ বলেন খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ১৫০ সালে, আবার কারোর মতে ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে; মানে চারশ বছরে গোলমাল। যেমন গ্রামের তেমাথা বুড়োকে বয়স জিজ্ঞেস করলে সে বলে, তা হবে তিনকুড়ি চারকুড়ি—মানে ষাট বা আশি, এও তেমনি। তেমাথা বুড়োর বয়সের হিসেব নেই, আর আদি মানুষের নেই কালের হিসেব।

এই হিরো পুলির প্রাথমিক নিয়মটা বের করলেন। আর তারপর বন্ধুদের ভ্যাবাচাকা খাওয়াতে গড়লেন বাষ্পে ঘোরানো একটা চাকা। একটা কড়ায়ে জল ফোটানো হলো, কড়ায়ের উপর রইল একটা হালকা বল। বাষ্পের শক্তিতে বলটা দিব্বি ঘুরতে থাকে। বন্ধুরা অবাক।...হিরো ওটুকু করেই শান্ত।...তবে তিনি বাতাসের শক্তি নিয়ে ভাবলেন। মেলায় যেমন কাগজের ফ্যান পাওয়া যায়, তেমনি একটা ফ্যান তৈরি করে উপরে

নিচে দুটো পুলি বসিয়ে সুতো দিয়ে দুটোকে ঘিরলেন। ফ্যান ঘুরলে নিচের পুলি ঘোরে—সেখানে একটা অন্য ফ্যান জলে রাখলে সেই ফ্যানের ডানায় জল লেগে ছিট্‌তে থাকে, ফুল রাখলে পুষ্প বৃষ্টি। এই ম্যাজিকটা হিরো মন্দিরে আকছার করতে থাকলেন। হাওয়া থাকলে বৃষ্টি হচ্ছে ; যারা মানত নিয়ে আসেন, তাদের বলা হলো, দেখ দেবতারা তোমাদের মানত মেনেছেন। বলে, বেশি করে নৈবেদ্য-দক্ষিণা দাও।

হিরো জলের শক্তিকেও কাজে লাগালেন। করাতের মত দাঁত-আলা গোল চাকার উপর থেকে জল বিশেষ কোণে ঢাললে জলের শক্তিতে চাকা ঘোরে। সেই চাকায় একটা ছোট হাতুড়ি বাঁধা থাকলে সে একটা ঘণ্টা বাজাতে পারে। মন্দিরে লোকেরা দেবতার পায়ে জল দিতে এলে সেই জলে চাকা ঘুরিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে হিরো মন্দিরের আয় বাড়িয়ে তুললেন।

তবে তাঁর সবচেয়ে বড় ম্যাজিক হলো—বেদীতে আগুন জ্বালালে আপনা থেকে মন্দিরের দরজা খুলে গিয়ে দেবতার মূর্তি দেখা দিতো।

ব্যাপারটা কিছু নয়। বেদীতে আগুন জ্বালানো হলো—বেদীটা তামার একটা বাক্স, তলায় ফুটো। আগুন জ্বললে বাষ্পের হাওয়া তাপে বেড়ে নিচে একটা জল ভরা পাত্রে নামে, বাতাসের চাপে জল পড়ে একটা বালতিতে —যেটার সঙ্গে দড়িদাড়া দিয়ে মন্দিরের দরজা বাঁধা। বালতিতে জল ভরলে ভারি বালতি নিচে নামে—দড়িতে টান পড়ে আর দরজা খোলে। যারা পুজো দিতে আসে তারা অবাক। আর হিরো দিব্বি পয়সা রোজগার করেন।

এই যন্ত্র তিনি তৈরি করলেন খেটেখুটে অঙ্ক আর হাইড্রোলিক্সের প্রাথমিক নিয়ম দিয়ে। তাছাড়া বায়ুশূন্য জলের আধার, পাইপ, জলের কল, পিস্টন, ইত্যাদি সব কিছুর কলা কৌশলটুকুও এই যন্ত্রে থাকলো। লোককে ঠকালেও কিন্তু হিরোকে আমরা প্রথম যন্ত্রবিদ বলতে পারি।

(২) হাতে নিল হাতিয়ার

প্রাগৈতিহাসিক মানুষরা পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের উপর খুব বেশি নির্ভর করত। তারা দেখতো, শুনতো, ঘ্রাণ নিত, স্বাদ নিত আর স্পর্শ নিত। কখন কোথা থেকে বিপদ আসে, সেদিকে যেমন তারা ছিল সদাসতর্ক, তেমনি চারপাশের প্রকৃতি—প্রাণ বা অপ্রাণ, তাদের ক্রিয়াকলাপ তারা লক্ষ্য করতো ; তার ফলে তারা নিরামিষ-আমিষ আহার শিখলো, গন্ধবিচার করে জানলো কোন্ গন্ধে ঘুম আসে, আনন্দ জাগে ; স্পর্শের বিচারে শীত-গ্রীষ্ম ঠাণ্ডা-গরম যেমন জানলো, তেমনি জানলো পশুর চামড়া গায়ে পড়লে ঠাণ্ডাকে এড়ানো যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।···সবচেয়ে বড় হলো, তারা পশুপাখিদের কাজকর্মগুলো ভালো করে দেখলো আর বিচার করল। ঘুণপোকা কি করে গর্ত কাটে, কাঠ ঠোকরা কেমন করে গাছে ফুটো করে, বাবুই কেমন বাসা বাঁধে, অথবা বুনো দাঁতাল শুয়োর গাছের শিকড় কেমন করে উপড়ে নেয়, ছুঁচালো মুখো ইঁদুর-ছুঁচো কেমন ভাবে সুরঙ্গ কাটে। এছাড়া দেখে বাঘের থাবা, হাতির পা, হরিণের আর গরু মহিষের শিং। এই দেখাকে তারা নকল করতে চাইলো। কখনো শরীর দেহ দিয়ে ; শরীর-দেহ অপারগ হলে ভাবনা হলো অন্য পথে করা কি যায় ?

বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষই একমাত্র প্রাণী যা তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দেখা-শোনা, ঘ্রাণ-স্বাদ আর স্পর্শ নেয়া শুধু নয়, তাই নিয়ে একটা পুরো কাজের অর্কেস্ট্রা এক-জন মানুষ করতে পারে—তার মস্তিষ্ক আর স্নায়ুকেন্দ্র ধীরে ধীরে সেই সমন্বয় আর নিয়ন্ত্রণের বলগা হাতে নিয়ে হাত পা আর পেশি চালনা করতে শুরু করে। সে কবে ? সে কখন ? না,—ঠিক ঠাক সময় এ যুগের মানুষের জানা নেই।

যা জানা আছে তা হলো সেই আদিম মানুষের হাতে গড়া নানা উপাদানের খোঁজ খবর। পাথরের খণ্ড, শিলীভূত কাঠ, ফ্লিণ্ট ইত্যাদি দিয়ে তারা যে সব কাটাকুটির অস্ত্র হাতিয়ার গড়েছিল, তাদের সংখ্যা

হলো লক্ষ লক্ষ। এই সময়ে হাড় দিয়েও শরীর-দেহের বাইরের কাজের হাতিয়ার মানুষ নিশ্চয় করেছিল। মুশকিল হলো, হাড় যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়, পাথর-ফ্লিন্ট ততো তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয় না বলে, হাড়ের খোঁজ খবর তত্ত্বতালাসে ফাঁক থাকে। আর একটা মজা হলো, সবসময়ে যে পুরো হাতিয়ার দেখা গেছে তাতো নয়; একটা অংশ পাওয়া গেল। যেমন ধরা যাক আজকের দিনের একটা তরোয়ালের বাঁট। সেটা নিয়ে ভাবলে বাঁটের সামনে যে কি থাকতে পারে তা যেমন কলা কুশলীরা বলতে পারে, আদিযুগের ভাঙা হাতিয়ার নিয়ে বিজ্ঞানীরা পুরো হাতিয়ারের ছকটা গড়েন।

'ক' অক্ষর শুনে প্রহ্লাদ ভাবেন কৃষ্ণকথা। বিজ্ঞানীদের ঠিক এক পথ। যন্ত্র নিয়ে ভাবনার আগে তারা ভাবেন হাতিয়ার কি করে এল। হাতিয়ার এলে, তার ব্যবহার দেখে, পাওয়া তথ্য থেকে নিয়ম আসে; তবে তো পাওয়া যাবে যন্ত্র। বীজকে বাদ দিয়ে, চারা গাছের পরিচর্চা না করে ফুল-ফল ভরা, ছায়া ঘেরা গাছের সৃষ্টি হয় না। বিজ্ঞানে যন্ত্রের ভাবনার সৃষ্টি তাই হাতিয়ার নিয়ে।

বানররা গাছে থাকে, তাদের অস্ত্রের প্রয়োজন নেই; তারা হাত দিয়ে ফুলফল ছিঁড়তে পারে, পাখির বাসা লুট করতে পারে; গায়ের উকুন বাছতে পারে, চিড়বিড় চিড়বিড় গায়ের জ্বালা চুলকে চুলকে থামাতে পারে। তাদের সামনের দুটো প্রত্যঙ্গ হলো হাত। বনমানুষ খায় নরম ডালের কুঁড়ি, ডাঁটা, ফল। এসব নিরামিশাষী প্রাণীদের শ্বাদন্ত আছে, তা নিয়ে এরা এসবের খোসাটোসা ছাড়িয়ে নিতে পারে। বেবুনদের হাতিয়ায়ের প্রয়োজন নেই; তাদের হাত খাটো, যেন খুঁটি। আঙুলগুলো শক্তিশালী, নখ পুরু, মুখ লম্বা আর শ্বাদন্ত তীক্ষ্ণ-ধারালো। তারা থাকে মরুভূমিতে; সেখানে মাটি আলগা, খোঁড়া সহজ। তারা খায় কন্দ জাতীয় মূল যার নাম ওয়েল উইটজিয়া। আবার কচ্ছপ ইঁদুর-সাপ ইত্যাদিকে গর্ত খুঁড়ে ধরে চিবিয়ে খেতে পারে। পাথর উলটে তলা থেকে যে গিরগিটি-কীট-পতঙ্গ-বিছা—এসবও ধরে খেতে পারে। রোদের তাপ থেকে যে প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য মাটি নিচে পাথরের তলায়

লুকিয়ে থাকে, হাত-আলা বেবুনের কাছ থেকে তাদের নিস্তার নেই। বেবুনরা ফলমূল যেমন খায়, তেমনি খায় প্রাণী, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ।

এই হাত-আলা প্রাণীরা মানুষের পূর্বপুরুষ কিনা বলার চেয়ে বলা যাবে, এরা মানুষের কাজের, কাজ নিয়ে চিন্তা ভাবনার গুরুকূল। এদের কাছ থেকে মানুষরা হাতের ব্যবহার শিখলো। শ্বাদন্ত,শক্তিশালী হাত, ধারালো নখ তাদের না থাকুক, নকল নবিশীর গুণটা এদের ছিল। আর তাই এল হাতিয়ারের চিন্তা।

মানুষের প্রথম ব্যবহার হাতিয়ার কি?—এটা আবার সেই ধরনের প্রশ্ন যার কিনা হাজার লক্ষ উত্তর হতে পারে। তবে বলা হয়, নানা মূল, ছোট ছোট শিকড় বা শিকার খুঁড়ে তুলবার জন্য যে চোখা লাঠি তারা ব্যবহার করেছিল সেটাই সম্ভবত প্রথম হাতিয়ার। এই হাতিয়ার তারা নকল করলো বুনো শুয়োরের দাঁত দেখে, বেবুনের হাত দেখে, খরগোশের পা দেখে। মুশকিল বাঁধলো ডালকে চোখা করা যাবে কি করে—সেখানে যে প্রয়োজন ধারালো অস্ত্রের! ভাঙা পাথর অথবা শিলীভূত কাঠ নিয়ে ভাবতে গিয়ে উত্তর পাওয়া গেল। এগুলো বেশ বিশাল বিশাল আকারে পাওয়া যায়,আবার পিটিয়ে পাটিয়ে ভাঙলে যে টুকরো পাওয়া যায়, তাও বেশ বড় সর। সব চেয়ে ভালো হলো ভাঙা ফ্লিণ্টের টুকরো।—নদীতে, বালিতে তারা আকছার এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে থাকে। তাদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজে পেতে, খুঁড়ে টুঁড়ে আদিম মানুষরা আনলো। নদীতে তাদের তো যেতেই হবে—কারণ নদী দেয় খাবার জল, আবার শিকারের সুযোগ।

ফ্লিণ্ট ভাঙা যেন ভাঙা বোতলের মাথা—তেমনি ধারালো; ভারি মারাত্মক অস্ত্র। ইস্পাত যখন মানুষ আবিষ্কার করেনি, তার আগে যত কঠিন পদার্থ তারা পেয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ছিল ফ্লিণ্ট। ফ্লিণ্টের তৈরি তীরের ফলা ধাতুর তৈরি ফলার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণী-দেহে প্রবেশ করতে পারতো। ফ্লিণ্ট দিয়ে তৈরি এই হাতিয়ার এই সেদিন,—স্পেনীয়রা যখন আমেরিকায় রেডইণ্ডিয়ান আজিটাকদের সঙ্গে

যুদ্ধ করতে যায়,—তখনো ব্যবহার হয়েছিল। চকচকে ফ্লিণ্টের তলোয়ার নিয়ে আমেরিকার আদিবাসীরা স্পেনীয়দের দিকে যখন এগিয়ে আসছিল, তখন স্পেনীয়দের ভয়ে বুক কাঁপে দুরুদুরু। তারপর যখন ইস্পাতের ভারি তলোয়ার আর হাতুড়ি নিয়ে যা-থাকে-কপালে বলে তারা এগিয়ে গেল, তখন দেখা গেল, ইস্পাতের আঘাতে ফ্লিণ্ট টুকরো-টুকরো হয়ে ভাঙে। ইস্পাতের কাছে ফ্লিণ্ট হেরে গেল। তবে সে তো অনেক অনেক পরের কথা। কত পরে? তা চার পাঁচ লাখ বছর পরে তো নিশ্চয়!

আরো একটা প্রমাণ আছে—ফ্লিণ্টের নানা ব্যবহারের প্রমাণ। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-মধ্য অঞ্চলে একদল আদিবাসী সমাজ এই সেদিনও, বিশ শতকের প্রথম দিকে, সেই আদিম মানুষের ফ্লিণ্ট ব্যবহারের ঘরোয়ানার রীতিনীতিটি বজায় রেখেছিল। এরা খোঁড়ার জন্য লাঠি, শিকারের জন্য বর্শা তৈরি করে। ফ্লিণ্টের হাতিয়ার দিয়ে বাঁকানো গাছের গুঁড়ি খোদাই করে নৌকো বানায়—আর তৈরি করে নানা কাঠের কাজ। কাঠ আর পাথর—এ দুটো দিয়েই মানুষ প্রাণীজগতে প্রভুত্ব করতে এগিয়ে এল। চোখা লাঠি দিয়ে খোঁড়ার শাবল, আর ছোটখাট প্রাণীকে পিটিয়ে মারা—দুটো কাজই হলো। আরো চোখা লাঠি দিয়ে বর্শা তৈরি হবে। যে প্রাণীরা ধীর গতি—তাদের মারা যাবে—শুধু খোঁড়ার লাঠিটা আরো লম্বা, আরো তীক্ষ্ণ হতে হবে। এই লাঠি বর্শা কতদূর পর্যন্ত ছোঁড়া যেতে পারে? তাসমানিয়ার আদিবাসীরা এই বর্শা দিয়ে ত্রিশ মিটার দূরে রাখা একটা সিকি ইঞ্চি তক্তা ছেঁদা করতে পারে—পারে আজকেও। এই বর্শা দিয়ে ষাট সত্তর কিলো ওজনের পশুমারা অসম্ভব নয়।

এই বর্শা ছুঁড়তে গিয়ে তারা জানলো, বাতাসের বেগে হাতিয়ারের যেমন গতি কমে, দিকও পালটায়। আর জানলো উঁচু থেকে কোনো জিনিস পড়লে তার শক্তি বাড়ে—দাঁড়িয়ে মাথার উপর থেকে পাথর ছুঁড়লে যত জোর পাওয়া যায়—বসে ছুঁড়লে জোর কম। আরো জানলো বর্শা দিয়ে শাবল দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির সময় খোঁড়াটি সোজা

করলে চলবে না, একটু আধটু কোনাকুনি বাঁকাবুঁকি করা দরকার। আর ভারি পাথর সরাতে সেই লাঠির খোঁচাটাই কাজে লাগবে। শুধু লাঠির নিচে একটা উঁচু পাথরটাথর দিলে নড়াতে সুবিধা।—এসব হলো অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া ব্যবহারিক নিয়ম। প্রথম লিভারের নিয়ম, গতির নিয়ম, হাওয়ার স্রোতের নিয়ম। বানর-বনমানুষ আর বেবুনদের রাজ্যে লাঠি হাতে মানুষ দুপায়ে খাঁড়া হয়ে দাঁড়ালো, আর কারো হাতে থাকলো ফ্লিন্ট। আগের দিনে দুপেয়ে জন্তুরা যা পারতো তার চেয়ে অনেক কাজ মানুষ করতে পারলো—পারলো কাঠের হাতি-য়ার দিয়ে। হাতিয়ারের সেই শুরু। আর যন্ত্রের বীজও সেখানে।

(৩) আগুন জ্বালো……

চতুর্দশ খৃষ্টাব্দেও আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ান জাতি ফ্লিন্ট বা চকমকির তরোয়াল নিয়ে লড়ায়ে নেমেছিল। তরোয়াল তৈরি হলো ফ্লিন্টের চাকলা দিয়ে। কয়েক লাখ বছর ধরে মানুষ ফ্লিন্টের ভাঙাভাঙি নিয়ে নানা কাজ করে, (আর এ কাজে নিশ্চয় তাদের অনেক হাত-পা-মাথা ভেঙেছে) তারা ফ্লিন্ট থেকে পাতলা চাকলা তোলার পদ্ধতিটা পেল। চাকলা তুলতে হলে ঠোকাঠুকিটা জোর দিয়ে করলে হবে না, হালকা চালে, ধীরে ধীরে, ঠুকেঠুকে তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ ধর তক্তা মার পেরেক জাতীয় হইচই এর কাজ নয়। এ হলো সত্যিকারের শিল্পের কাজ ; মানুষের পেশি, চোখ আর স্পর্শকে নিয়ন্ত্রণ করে সমন্বয়ের কাজ ; ফ্লিন্টের চাকলা খসাতে গিয়ে মানুষ যন্ত্রের কারুকৃতি শিখে গেল।
চাকলা তৈরি করতে গিয়ে অনেক অব্যবহার্য ফ্লিন্ট পাওয়া যায়। না, আদিম মানুষ তাদের ফেলে দিল না। ফ্লিন্ট তো আর সূর্যের আলো তাপ নয়—যে যত চায় তত পাবে। ফ্লিন্টের চাহিদা যেমন, তেমনি সর্বত্র পাওয়াও যায় না। অতএব, পড়ে থাকা ফেলে যাওয়া

ফ্লিণ্টের ভাঙা চোরা অংশ দিয়ে তারা কাজে নামলো। এদের দিয়েও হাতিয়ার হলো। চাকলা দিয়ে ছুড়ি, তরোয়াল হয়; আর ফেলে রাখা ফ্লিণ্ট দিয়ে ঘষা মাজা, ধারতোলা হতে পারে। যা মানুষের প্রয়োজন, তাকে নিঙরে সব রসটুকু বের করে নিতে হবে—এটাও অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জানলো।

মানুষ একফলা ছুরি করল, তার একদিকে ধার। তারপর করলো তুই ধার-আলা ছুরি। সেখান থেকে ছোরা। আর তারপর ছুরির তুপাশে তুটো ধারের তারতম্য এনে স্থূল সূক্ষ্মকাজ এক হাতিয়ার থেকে করলো। আর গড়লো তুরপুনের মতো ফুটো করার যন্ত্র—যা দিয়ে প্রাণীদের মাথা ফুটো করে দিব্বি মস্তিষ্ক টেনে টুনে চুষে চুষে খেতে পারে।

এদের সঙ্গে সঙ্গে এল পড়ে থাকা ফ্লিণ্ট থেকে গড়ে তোলা কতগুলো বলের মত হাতিয়ার—হয়তো যা আদিম গোলা, যা ছুঁড়ে জন্তু মারার জন্য ব্যবহার হতো; অথবা এগুলো বাদাম, হাড় ইত্যাদি শক্ত জিনিস ভাঙায় ব্যবহারের কাজেও লাগতে পারে। তবে এসব ভাঙাভাঙির কাজ তো সাধারণ পাথরেই হতো—এতো গোলগাল রূপ দেবার কারণ তবে কি?—কারণটা যে কি তা সঠিক জানা নেই, আছে অসংখ্য অনুমান।...তবে এ সময়ে তারা কুঠার তৈরি করলো—করলো সেই ফ্লিণ্ট বা নানা স্ফটিকের পাথর থেকে। তা দিয়ে বেশ গাছটাছ কাটার কাজ চলল। কুঠার হাতে মানুষ পরশুরাম হয়ে বনজঙ্গলের মোকাবেলায় নামল—সেও ধরা হয় তিনচার লাখ বছর আগে।

এই সময়ে তারা এক অদ্ভুত হাতিয়ার তৈরি করলো—যার চেহারাটা হলো পাখির ঠোঁটের মত। কোনো কিছু ঠুকরে, অল্প স্বল্প ঠোকাঠুকি করতে ভারি কাজের এই হাতিয়ার; এ-হলো হাতিয়ার বানাবার হাতিয়ার। সূক্ষ্ম কাজ করার জন্য ধীর স্থির কলাকুশলীদের যন্ত্র। একে ঠিক হাতিয়ার বলতে বিজ্ঞানীরা চাইলেন না—বললেন, এটা যন্ত্র; তার কারণ এর মধ্যে যে ভাবনা আছে, তা হলো বিজ্ঞান ভাবনা, নিয়ম নিয়ে ভাবনা,—পাখির চঞ্চুর ব্যবহার নিয়ে দেখা, এই দেখাকে চোখের বাইরে টেনে নামানো।

আর এই প্রথম যুগের আশ্চর্য হাতিয়ার আবিষ্কার হলো ঐ হাত কুড়োল—যা হয়তো হাতলহীন। এই হাতিয়ার এতদিনে মানুষের কাছে দৈবী প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন খ্রীষ্টানদের ক্রশ, তেমনি হাত কুড়োল হলো আদিম মানুষের পবিত্র চিহ্ন। এর স্মৃতি এখনো অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের কাছে টি*ঁকে আছে ; তারা একে বলে চুরিঙ্গা। শিকারের আগে চুরিঙ্গার পুজো করে, শিকারের পর এদিয়ে মাংস কাটে, চামড়া অ*াঁচড়ে পরিষ্কার করে। এসব হাত কুড়োল কিন্তু বেশ ভারি ছিল, বয়ে নিয়ে যেতে হলে বেশ কষ্ট হতো। তবে মানুষের নিজের আড্ডায় এদের ব্যবহারটা সহজ ছিল। আর সঙ্গে নিয়ে যেত কিছু ভারি চাকলা দিয়ে গড়া কুড়োল ; ভারি, তবু তত ভারি নয়।

প্রথম যুগের এই সব হাতিয়ায় নিয়ে ছোট কাঠকাটা, কাঠ চাঁছাছোলা করা, পশু কাটা, মাংস অ*াঁচড়ে নেয়া, চামড়া ছড়ানো—বেশ ভাল ভাবেই চলতো। হাতিয়ারের সঙ্গে হাতলের যোগও ঘটে এই যুগে কোনো এক সময়ে। প্রথমে তারা কাঠের মাথায় পিচ বা আঠা দিয়ে ছুরি বা বর্শা ফলক আটকাতো। রাস্তায় দেওয়া পিচ প্রকৃতিতে পাওয়া যেত; আর মানুষ জানতো, এই পিচের আটকে রাখার ক্ষমতা আছে। এই সব হাতিয়ার পাওয়া গেছে সর্বত্র, যেখানে যেখানে পৃথিবীতে মানুষ পা ফেলেছে। আমাদের ভারতেও।

আর তার পর মানুষ এক বিরাট আবিষ্কার করে তোলে। মানুষ আগুনকে বশ করতে শিখলো। আগুন-পোড়া মাংস খেতে সুবিধের, আগুন-পোড়া হাড় থেকে মজ্জা বের করে নেয়া যায় ; আগুন হলো নিরাপত্তা, আগুন শীতের উষ্ণতা, অন্ধকারের জ্যোতি। আর রান্না মাংস বা খাদ্য মানে খাবার খাওয়ার জন্য তাদের সময় কম দিতে হলো। মানুষের চোয়াল যত শক্ত বা দাঁত যত বড় আর তীক্ষ্ণ হোকনা কেন,তারা যদি কাঁচা ফলমুল বা কাঁচা মাংস খেতে থাকে, তবে দিনে শিকার আর হাতিয়ার তৈরি কাজে সময় অনেক কম পায়। খাওয়ার সময় কমিয়ে নিয়ে হাতিয়ার আর শিকারের কাজে সময় বাড়াতে এগিয়ে এল আগুন। আর রাত্রে আগুনের আলোতে বসে গাল গল্প চলে, অবসর সময়টা

অন্ধকারে না কাটিয়ে হেসে খেলে কাটাতে পারে। মোটামুটি বলা যায়, খাদ্যবস্তু পাক করতে শিখেই মানুষ চার পাশের পাশব-জান্তব-ভৌত অস্তিত্ব থেকে নিজেকে আলাদা করে, আলগা করে সরিয়ে নিতে পারলো। তার আগের দিনগুলো ছিল বেঁচে থাকার জন্য অনির্বাণ প্রচেষ্টায় ভরা। আগুন বেঁচে থাকায় নতুন মাত্রা জুগিয়ে তোলে—আগুন দিল সংস্কৃতি, আগুন আনে পরিবর্তনের ধারা।

আগুনের ব্যবহার শিখে অন্য প্রাণী থেকে মানুষ পৃথক হয়ে গেল। তার দেহের বাইরে আগুনই হলো প্রথম শক্তির উৎস, যা সে নিজের ব্যবহারে লাগাতে পারলো। আগুন হাতিয়ার নয়, আগুন হলো প্রকৃতির নানা শক্তিকে করায়ত্ত করার ব্যাপারে তার চাবি কাঠি!

আগুনকে বলা যায় প্রথম বিজ্ঞানের আবির্ভাব, প্রথম আবিষ্কার, প্রথম আত্ম সচেতনা। আগুন নিয়ে মানুষ একলহমায় সভ্যতার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে হাজির হয়।

দুপেয়ে মানুষ লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে আগুনের মশাল তুলে দূরে চেয়ে দেখতে পারে!

(৪) মানুষের যন্ত্রণা

যন্ত্র নিয়ে যত না ভাবনা, তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা হলো, যাদের জন্য এই যন্ত্র, তাদের নিয়ে ভাবনা, তাদের নিয়ম গড়ার খোঁজে পিছনে ফিরে তাকানো। মানুষকে বাদ দিয়ে, তার চিন্তাভাবনাকে এড়িয়ে যন্ত্রের ভাবনা চলতে পারেনা।

কবে যে মানুষ এল, কবে থেকে যে তাদের ভাবনা শুরু, সে সব হিসেব নিকেশে অনেক বছরের ফারাক থাকতে পারে। তা থাক। মানুষের বিজ্ঞান চিন্তায়, যন্ত্র আবিষ্কারে যেমন পর্যায় বিভাগ আছে, মানুষের ইতিহাসেও তেমনি পর্যায় আছে। এখানে ধরা হবে চারটা

পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর দুই পা দুই হাত-আলা, মাটিতে নামা একটি প্রাণী—যার অনেক প্রজাতি পৃথিবীর এদিকে সেদিকে দেখা দিল, আর নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। এদিক দিয়ে দেখলে আমরা দেখি, সেই প্রথম যুগে মানুষ নামক নানা প্রজাতি নিজেদের মধ্যে যে ঝগড়া-কাজিয়া শুরু করেছিল—সেই ট্র্যাডিশন সমানে বয়ে চলেছে।

এই সব মানুষ প্রজাতির একটি, যাকে বলা হয় বুদ্ধিমান মানুষ অথবা হোমো স্যাপিয়েন্স। শেষ অবধি লড়ায়ে তারাই টিকে থাকলো। এই লড়াই প্রকৃতির সঙ্গে, প্রাণীজগতের সঙ্গে, নিজেদের নানা দলের সঙ্গে—যে লড়াই হলো বেঁচে থাকার টিকে থাকার লড়াই। এই লড়াই চলার কালে মানুষ মোটামুটি হাতিয়ার বানাতে শিখেছিল, কথাও বলতো। তবু হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতির একটা বাড়তি সুবিধা ছিল, সেটা তাদের বুদ্ধি, যা হলো নানা ইন্দ্রিয়কে এক সূত্রে বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগানো।

মোটামুটি পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষের আবির্ভাব। তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতো, তাদের দুই বাহু আর হাতের ছিল স্বাচ্ছন্দ্য গতি, তীব্র ফোকাস যুক্ত তাদের চোখ, সূক্ষ্ম বিচার শক্তি সম্পন্ন, সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষম এবং তীব্র অনুভূতি ভরা তাদের মস্তিষ্ক আর কথা বলার ক্ষমতা। এই পাঁচটি বিশেষত্ব নিয়েই যে প্রথম মানুষ এসেছিল তা বলা যায়না। এদের কতগুলো পুরনো, কতগুলো নতুন। আর মস্তিষ্কের যে বিশেষ গুণ—তার সব কটি ছিল হোমো স্যাপিয়েন্সদের। এই পাঁচটি বিশেষত্বের সমন্বয় মানুষ করতে চেয়েছিল, সবচেয়ে বেশি সমন্বয় করতে পেরেছিল শুধু সেই হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতি। যোগ্যতমের উদ্বর্তনের রীতি মেনে বলা যায়—এরাই তাই টিকে গেল।

হোমো স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাব ধরা হয় মোটামুটি ইউরেশিয়া ভূখণ্ডের তুষার রেখার দক্ষিণে, এবং ধরা হয় এই একটি মাত্র অঞ্চলেই তারা ছিল। প্রথম পর্যায়ে মানুষ হাতিয়ার বানিয়েছে, কাঠ আর পাথরের হাতিয়ার। খাদ্য সংগ্রহ, খাওয়া আর ভবিষ্যতের জন্য টিকে থাকা—

এছাড়া পশুর অতিরিক্ত যে কাজটুকু তারা করেছিল, তাহলো হাতিয়ার বানানো। হাতিয়ার হাতে নিয়ে মানুষ পশু থেকে আলাদা হয়ে গেল। কঠিন এই সময়। এই যুগে বার বার তুষার প্রবাহের ঢল নেমে এসেছে। ধরা হয়, পর পর চারবার ঢল এসেছে প্রথম পর্যায়ে। প্রায় সাতলক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে প্রায় ছয়লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত এই কাল।—যে বিরাট পরিসরটা দেখা যায়—এই সময়ে নিজেরা লড়াই করে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে খেয়োখেয়ির যুগে হোমো-স্যাপিয়েন্স নামের প্রজাতি সব প্রজাতিকে, তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত-আত্মসাৎ করে একা মানুষ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ তারা আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানলো।

আগুন নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। তখন চতুর্থ হিমবাহের অগ্রগতি চলেছে। সেই কালের ব্যাপ্তি প্রায় ত্রিশহাজার বছর। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ আজ থেকে প্রায় দশবিশ হাজার বছর আগে। এই পর্যায়ে মানুষ খাদ্য পাক করতে জানলো ; আগুন, কেবল আগুন, তাকে শীত থেকে বাঁচাতে পারলো না। তাদের প্রয়োজনে তারা পশুর চামড়ার চাদর ব্যবহার করতো ;—এবার পরিধেয় সেলাই করতে জানলো। আর এল যাযাবর বৃত্তি। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিকার ভূমির খোঁজে এগিয়ে চলা। গোটা পৃথিবীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি বেরিং প্রণালী পার হয়ে দুই আমেরিকাতেও ঢুকে গেল। মানুষ এই পর্যায়ে দেখালো, সে অন্য প্রাণীদলের থেকে কত আলাদা ; —সব প্রাণীতাত্ত্বিক অঞ্চল, সে দখল করতে পারে। আগুন হাতে নিয়ে প্রকৃতিকে একটি বৃহৎ কাঁচকলা দেখাতে সে উদ্যোগী হলো। পাথরের হাতিয়ার ছেড়ে এই সময়ে মানুষ তৈরি করে তীর ধনুক। আর শিকারের সঙ্গী হিসেবে পোষ মানালো কুকুরকে। এই পর্যায়ে শিকার করা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে, আগুন হাতে আছে বলে, মানুষ শিল্প কারিগরিতে মন দিতে পারলো। অর্থাৎ মানুষের হাতে কিছুটা অবসর এসে গেল।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ হলো ইতিহাস-পূর্ব কালে। যার শুরু দশবিশ

হাজার বছর আগে। এর পর শুরু হলো মানুষের নতুন অভিযান। মানুষ খামারের পশু পোষ মানালো, কৃষি কাজ শুরু করলো, পোড়া-মাটির কাজ শুরু হলো এবং এল ধাতুর ব্যবহার,—তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা, সোনা, রুপো বা দস্তা। লিপির আবির্ভাবও এ যুগে। আর এল সংখ্যাতত্ব, এবং চাকা আর ঘোড়ার ব্যবহার। নগর সভ্যতার শুরু হলো প্রায় খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ছহাজার বছর আগে। এক এক করে অভিজ্ঞতার পুঁজি ভরিয়ে তুলে মানুষ হাঁটি হাঁটি পা পা করে খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২৫০ বছরে হাজির হলো—তখন শুরু হলো যন্ত্র নিয়ে ভাবনা। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের শুরু পর্যন্ত যন্ত্রের ভাবনা নিয়ে এই যন্ত্রণা চলল। লোহা, মুদ্রা, কামান, মুদ্রাযন্ত্র, কৃষিযন্ত্র, ঘড়ি, গভীর সমুদ্রের জাহাজ, বিদ্যুৎ আর কম্পাস—যা পৃথিবী পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নতুন বাণিজ্যের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে তারা এই পর্যায়ে হাজির হলো। যন্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞান আসে, যন্ত্র নিয়ে বিজ্ঞান চলে ; কখনো যন্ত্র এগোয়, কখনো বিজ্ঞান। এই দেয়া নেয়ার খেলায় মেতে থেকে মানুষ চতুর্থ পর্যায়ে হাজির হলো—যা বিজ্ঞানের যুগ, যন্ত্রের যুগ।

হাড়ের হাতিয়ার থেকে তীর ধনুক তুলে নিতে কয়েক লক্ষ বছর গেল। তার আগে মানুষ তৈরি করল এক বিশেষ বাটালি যাকে বলা হয় বিউরিন। এই বাটালি দিয়ে তার পক্ষে হাড়, শিং, হাতির দাঁত ইত্যাদি থেকে নতুন হাতিয়ার তৈরি সম্ভব হলো। ফ্লিন্ট থেকে বিউরিন অনেক ঘাতসহ, কঠিন জিনিসে কাজের পক্ষে উপযোগী। বিউরিনও পাথরের হাতিয়ার। বানানো পদ্ধতি সহজ, তবে সূক্ষ্ম নিপুণতার দরকার হয়। একহাতে ফলক ধরে তারএক প্রান্তে একঘায়ে,—খুব জোরে অবশ্য নয়—তীব্র আঘাতকরলে আঘাতের জায়গাটা থেতলে যেন যায় ; প্রান্তটি তখন তীক্ষ্ণ হয় ; অথচ পুরো ফলকের প্রশস্ততা অটুট থাকে বলে সেই হাতিয়ার কঠিন দৃঢ়। এই বাটালি দিয়ে হাড়ের শিঙের হারপুন তৈরি হলো—এই হারপুন পশুর হাড়ে লাগলে ভাঙে না। আর হারপুনের তীক্ষ্ণতা বাড়াবার জন্য ফ্লিন্টের ছুরি হারপুনের ডগায় বসিয়ে দেখা যায়। চামড়ার ফালি দিয়ে ফ্লিন্টকে হাতিয়ারের মাথায় আটকানো হতো—

আর তার জন্য হারপুনের মাথায় ফ্লিণ্টের তুরপুন দিয়ে দুটো চারটে ফুটো করে নেওয়া হতো। হারপুন পাবার পর সমুদ্র প্রাণী শিকারে জটিলতা কমে গেল। বর্শা আর হারপুনে পার্থক্য আছে। বর্শার ফলক দণ্ডের সঙ্গে স্থায়ী ভাবে আটকা, কাজেই বর্শা বিদ্ধ জন্তুর পিছনে ছোটাছুটি করে ধরা ছাড়া উপায় নেই। আর হারপুনের মাথাটা কোনো জন্তুর দেহে বিঁধে আটকে যাওয়া মাত্র দণ্ড থেকে খুলে যায়। দণ্ড বা হারপুনের মাথায় চামড়া বাঁধা থাকে বলে, দণ্ডটি খুলে ভেসে গেলেও তুলে নিতে অসুবিধে নেই।

হারপুনের মাথা

বিউরিন অনেক করলেও তারও অনেক অসুবিধা ধরা পড়ে। বিউরিন দিয়ে প্রাথমিক আকারটা গড়া যেত। তারপর জিনিসটা সমান অথবা কিনারা ধারালো করার জন্য কারিগর বেলে পাথরের টুকরো দিয়ে, চামড়ার উপর বালি ইত্যাদি রেখে পালিশ করতো—যেমন স্যাণ্ড পেপার ঘষি সেই ভাবে হাতিয়ারের ডগা মসৃণ করে তুলতো। এসব যন্ত্র নিয়ে নরম কাঠ কাটা গেল, কিন্তু বড় গাছ বা তকতা কাটা যায় না। এই সব হাতিয়ারে কাঠের বা শিঙের হাতল লাগিয়ে কুড়োল বা বাইস হলো। হাতলের বরাবর ধার থাকলে কুড়োল আর ফলক হাতলের সমকোণে থাকলে বাইস। শুধু এসব কাজে যে বাটালি ব্যবহার হলো তা জেড পাথরের মত কঠিন পাথর থেকে তৈরি। গাছ কাটা তকতা কাটা হাতে এসে গেল। যা বিউ-রিনের ছিল কয়েক ঘণ্টার কাজ, এই সব যন্ত্রে তা হবে কয়েক মিনিটে। এইবার মানুষ বাড়ি বানাতে, শালতি নৌকো বানাতে লেগে যেতে পারে।

বাইস থেকে কোদাল

পালিশ করা এই কুড়োল যে কবে বানানো হলো—কেউ তা জানে না। তবে ধরা হয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৬০০০ বছর আগে, মানুষের কৃষি জীবনের আগে, এই কুড়োল সৃষ্টি। শিকার ছেড়ে কৃষিজীবন আরম্ভ করার আগে তারা হাতিয়ার, নৌকো, তাঁবুর কাঠামো, খোয়ারের বেড়া ইত্যাদি বানাবার কালে নিশ্চয় এই কুড়োল কাজে লাগিয়েছিল। শালতি, স্কি, বরফের জুতো, স্লেজগাড়ি সবকিছু কাঠ থেকে পাওয়া গেল। আর এই কাঠ নিয়ে ভাবতে গিয়ে ধরা পড়ে তীর ধনুক !

(৫) তীরধনুকের ভাবনা

কাঠের বর্শা কিংবা ফ্লিণ্টের ফলক লাগানো বর্শা নিয়ে মানুষ যখন শিকারে নামলো তখন তার অনেক সমস্যা। বর্শা ছুঁড়তে হলে শিকারের অনেক কাছে যেতে হবে, নইলে নিক্ষেপের ফায়দা ওঠানো যায় না। তিনের বেশি বর্শা হাতে নিয়ে শিকারে যাওয়া মুশকিল আর বর্শা অনেক দূর ছোঁড়া যায় না। বর্শার পাল্লা কি করে বাড়ানো যায় ভাবতে গিয়ে মানুষ এক নতুন সহযোগী হাতিয়ার বানিয়ে তুললো। এটা হলো প্রায় হাত দেড়েক লম্বা একটা কাঠ, তার একদিকে আছে হাতে ধরার জন্য খাঁজকাটা আর অন্য দিকে আছে বর্শা আটকাবার জন্য একটা গর্ত কিংবা একটা গোঁজ পোঁতা। সব মিলিয়ে কাঠের এই হাতিয়ারটাকে বলা যায় বাহুর পরিবর্ধিত রূপ—অর্থাৎ সেই আর্কিমীদিসের লিভারের তত্ত্বকে ডেকে আনা হলো। হাতকে লম্বা থেকে লম্বাতর করলে বর্শার পাল্লাও দীর্ঘতর হবে। অভ্যাস করলে হাতে ছোঁড়া বর্শার মত নিপুণ দক্ষ হওয়া যায়। এস্কিমোরা এখনো এই বর্শা পাখি মারার জন্য ব্যবহার করে, আর করে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা। এই হাত-টেনে-লম্বা-করা বর্শা ছোঁড়ার হাতিয়ার হলো তীরধনুকের পূর্বসূরী।

গাছ নিয়ে ভাবতে গিয়ে মানুষ গাছের ডালের নমনীয়তা লক্ষ্য করে

ছিল। ডাল ধরে নিচে ঝুলে ডাল ছেড়ে দিলে কেঁপে কেঁপে সে আবার আগের জায়গায় হাজির হবে। বড় ঝড় ডালপাতা নাড়া দেয় ; ঝড় থামলে গাছ যেমনটি তেমনটি। নমনীয়তা আর স্থিতিস্থাপকতা এ দুটো হলো গাছের ডালের গুণ ; বাঁশের গুণ। এক টুকরো বাঁশের চিলতের আগায় ঢিল রেখে বাঁশটাকে নিচে একহাতে ধরে, উপরে ঢিল শুদ্ধু অন্য হাতে পিছনে টেনে উপরের হাত ছেড়ে দিলে বোঁ করে ঢিল উড়ে যায়। আবার ধরা যাক গুলতি। দুটো শাখা যেখান থেকে বেড়িয়েছে—সেখানে Y চিহ্নের ছাপ থাকতে পারে। এর আগায় চামড়া বেঁধে চামড়ার মাঝে পাথর রেখে টেনে ছাড়লে পাথর দূরে যায়—এই তো গুলতি। তার মানে অনেক কম শক্তি খরচ করে ডালের নমনীয়তা স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে পাথর-টাথর দিব্বি দূরে ছুঁড়ে দেয়া যায়—অভ্যাস করলে টিপসই হতে পারে। গুলতির চিন্তায় দুটো ভাবনা—এক হলো ডাল—তার গুণ ; আর দ্বিতীয় চামড়া—তার গুণ। দুটো গুণ কিন্তু হরেদরে এক। দুটোতেই স্প্রিংএর ছাঁদ লুকিয়ে থাকে।

ধনুকের তত্ত্ব আর স্প্রিংএর তত্ত্ব এক। ধনুকের ছিলা—সেটা চামড়া বা পাতলা বাঁশের কঞ্চি, যাই হোক না কেন, তাকে পিছন দিকে টেনে নিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিতে হয়। ধীরে ধীরে একটু একটু করে যে শক্তি গুণে-ছিলায় প্রয়োগ করা হয়েছিল, এক লহমায় তার মুক্তি ঘটে। হাতের টানের সঙ্গে যোগ হয় গুণ আর ছিলার নিজস্ব স্বাভাবিক গুণ। ভাল শিকারীর হাতে ছোঁড়া তীরের যে বল বা ফোর্স তা পাঁচ হর্স পাওয়ার বা পাঁচ অশ্বশক্তি হতে পারে। এক তীরে, ঠিক মত লাগালে, হরিণকে এফোঁড় ওফোঁড় করা যায়। অবশ্য নির্ভর করছে তীরের ফলাটা কিসের। ফলাটা অবশ্য সেই প্রথম যুগে ফ্লিন্টেরই ছিল। তাই যথেষ্ট। পেশি বহুল আদিম মানুষ তার ধনুক দিয়ে বিরাট বলশালী বাইসনের দেহ ফুঁড়ে দিতে পারত। অন্তত স্পেনীয়রা তাদের আমেরিকা অভিযানে রেড ইণ্ডিয়ান শিকারীদের একাজটা হামেশাই করতে দেখেছিল।

তবে ধনুক প্রথম হয় সম্ভবত আফ্রিকায়। আর এই আফ্রিকা থেকে এদিক ওদিকে ধনুক ছড়িয়ে পড়ে। আর আশ্চর্য হলো অস্ট্রেলিয়ার

আদিম অধিবাসীরা বিশ শতকের প্রথমে ধনুকের ব্যবহার জানতো না। ধনুক হাতে পাওয়া মানে দূর থেকে শিকারের সুযোগ বাড়িয়ে নেয়া। তাছাড়া দীর্ঘ দূরত্বে লক্ষ্য নির্ভুল করতে, বাতাসের দিশেহারা এলোমেলো টানকে সংযত করতে, তীরের পিছনে একরাশ পালক

গুহাচিত্র—স্পেন

লাগানো হলো—যেন লাগাম। এই ধনুক হলো নিঃশব্দ-অস্ত্র। শিকারী লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেও চট করে আরেকটা ছুঁড়তে পারে—পারে শিকারের পালে আলোড়ন ওঠার আগেই। তার তূণে বেশ কটা শর থাকতে পারে, আর অটোমেটিক অস্ত্রের মত পরপর তীর ছুঁয়ে যাওয়া দক্ষ শিকারীর কাছে অসম্ভব নয়। নিঃশব্দ-অটোমেটিক অস্ত্র হিসেবে ধনুক আজো সৈন্যদের প্রিয়। গত দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ধনুক দিয়ে লড়াই হয়েছে; ভাবনা হয়েছে ধনুকের তত্ত্ব নিয়ে। গতি বিজ্ঞানের জগতে ধনুকের অবদান অনেকখানি। এখানে আছে স্প্রিংএর ভাষা, বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রণের ভাবনা আর ভাবনা ধনুকের তীর কিভাবে ছুটে যায়। ধনুকের ছুটে যাওয়ার গুণটি দিয়ে মধ্য যুগে গালিলিওর পূর্বসূরীরা ভাবলেন। এই গুণের নাম দিলেন IMPETUS ইমপিটাস ঃ শব্দটা আজ-কের দিনের INERTIA বা জাড্য শব্দের কাছাকাছি যেন। ১৩৫০

খ্রীষ্টাব্দে জন বুরিদান ইমপিটাস শব্দটি আনলেন ; বললেন ছোঁড়ার গতির মধ্যে এই ইমপিটাস জুতে দেয়া হয়, ইমপিটাস তারপর ছুঁড়ে দেওয়া বস্তু নিয়ে চলে। যেমন টেনিস বলের লাফানো, ঘন্টার কম্পন অথবা উপর থেকে নিচে পড়া বস্তু—এ সবেই ইমপিটাস থাকবে। গালিলিও ঠিক তা বললেন না। তিনি ইমপিটাস নামের গুণটিকে নিয়ে টানা হ্যাঁচরা না করে বললেন, যদি কোনো গতিশীল বস্তুকে না থামানো হয়, তবে সে চিরকাল চলবে। আর বললেন ছুঁড়ে দেয়া বস্তুর গতি পথে তুটো টান কাজ করবে—এক হলো যেদিকে ছোঁড়া হয়েছে সেই দিকে যাওয়া,—তুই হলো উপর থেকে নিচে নামা। ধনুকের তীরে সেই যুগ্ম গতি কাজ করবে। ধনুকের তীরের পথটা কেমন হবে ?

ওয়াল্টার রীফের কামানের গোলার পথ

পুরনো মানুষ ভাবতো সোজা—তীরের মত সোজা। তেমনি কি ? চোখে দেখে বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে ছবি আঁকলেন তা কিন্তু সোজা নয়, অনেকটা ধনুকের মতো, অর্ধ বৃত্তের মতো, রামধনুর মতো বাঁকা। আর ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াল্টার রীফ (RYFF) যে ছবি আঁকেন সে একেবারে সোজা কোনাকুনি উঠে গিয়ে বাঁক খেয়ে নেমে যাওয়া। গালিলিও ধনুকের তীরের অঙ্ক কষতে লাগলেন। চোখে দেখা নয়, অঙ্ক দিয়ে দেখা। তিনি দেখলেন প্রতি সেকেণ্ডে ছুঁড়ে দেওয়া বস্তু বা প্রোজেকটাইল আনুভূমিক বা হোরাইজেণ্টল একই পথ পার হয়। আর প্রতি সেকেণ্ডে সে যে নিচে নামে তার গতি সময়ের বর্গের সঙ্গে মিল টানে—তার মানে ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫ ইত্যাদি। তুটো গতি মিলেজুলে যা পাওয়া যায় তা হলো প্যারাবোলা। দ্য ভিঞ্চির রামধনুর থেকে আলাদা।...
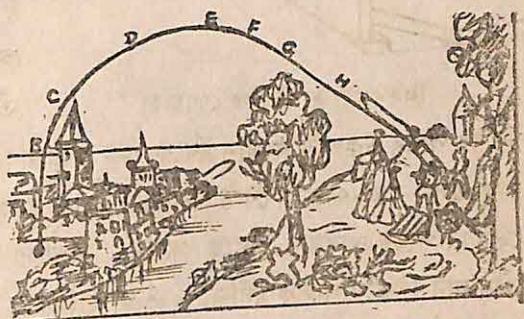
ধনুকের তীরের পথ সোজা নয়। পথ বাঁকা, পথ হলো প্যারাবোলা।···
কবে তীর ধনুক এসেছে খবর নেই। তার পথে কয়েক হাজার বছর হেসে খেলে চলে গেছে। আর তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে গালিলিও পথের নকশাটি এঁকে দিলেন। ধনুক নামক হাতিয়ার তখন যন্ত্রের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়।
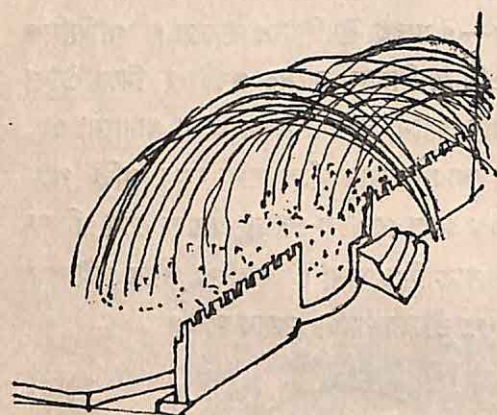
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ফোয়ারা

আর তারপর ধনুকের তীরের পথ, ট্রাজেক-টারির পথের নকশায় কামান থেকে শুরু করে সব কিছু ছোঁড়ার হিসেব কষা হল—যন্ত্র এলো। কেউ জানলো না—রকেট থেকে স্পেসশিপ ছোঁড়ার পথের ভাবনায় আছে আদিম মানুষের ধনুক-তীর, অথবা শুধু তীর যার পিছনে পালক গোঁজা। তারা হাতিয়ার গড়েছিল বলে আমরা যন্ত্র পেলাম, যন্ত্র যুগে এলাম।

(৬) চাষ করি আনন্দে···

হিমবাহগুলোর শেষাশেষি পশুপালক যাযাবর মানুষের একটা অংশ নদীর অববাহিকায় এসে হাজির হলো; আর অকস্মাৎ, কেমন করে জানি, চাষবাস শিখে ফেলে। চাষ মানে, উবচে পরা বন্যায় ভেসে যাওয়া নদীর পাড়ের উর্বর মাটি কোনোমতে সমান করে তাতে বীজবোনা, ফসল কাটা। মিশরে নীলনদীর পাড়ের জমি নরম। জল আটকানোর জন্য বাঁধের আল বেঁধে নদীর ধারে জমিতে বেশ

ছোটবড় নকশা কাটা হলো, নানা আকারের নানা সাইজের ক্ষেত। আর জলভরা কাদা মাখা জমিতে মই বা পাটা দিয়ে সমান করে টেনে নিয়ে জমি তৈরি করে বীজবোনা। ফসল পাকলে পাথরের কাস্তে দিয়ে গাছ কাটা। বাস। তারপর বসে থাকা হবে আবার কবে বন্যা আসবে, নদীর জল পাড় ভেঙে, আল ভেঙে, কলকল খলখল হেসে চারপাশ ডুবিয়ে যাবে। জল নেমে গেলে দেখা যায় কাদাভরা জলেভরা জমি, কোথাও কোনো আল-বাঁধের চিহ্ন নেই। জমি জিরেত ঠিক-ঠাক করতে তখন পাওয়া গেল জ্যামিতি। মিশরীয়রা জ্যামিতির চিন্তা আনলো।

মানুষ তখনো অরণ্য কেটে বসত করেনি, জমিও তৈরি করেনি। আর তারপর চাষবাসের রীতি ধরে এরা দেখে গাছের গোড়ার ফাঁকে ফাঁকে দোআঁশ উর্বর মাটি শস্য বোনার উপযুক্ত। অন্যদিকে দলের পশুদের আটকে রাখার জন্য, নিরাপত্তার জন্য দরকার খোঁয়ারের। বন পরিষ্কার করা আর খোঁয়ার করা—দুকাজের জন্য যে কাঠকাটা হাতিয়ার দরকার তা হলো কুড়োল—সে তো মানুষের হাতে। এই কুড়োল হাতে নিয়ে চাষবাসে নেমে মানুষ স্থিতু হলো। তাদের হাতে এল গম, গরু শুয়োরের মাংস, দুধ, ডিম, মৃৎপাত্র, বস্ত্র, পশম, মদ। আবাদের সব গাছ তারা কাটতো না। তারা দেখেছিল কাণ্ড থেকে বাকল তুলে নিলে গাছ আপনা থেকে মরে যায়। সেই বাকল তারা পরতে পারতো—আশ্রম বালিকা শকুন্তলাও পরেছিল। তারপর গাছ কেটে আগুনে পোড়াতে পারতো তারা। এই পোড়াতে গিয়ে যেমন তারা পেল কাঠ-কয়লা, তেমনি পোড়ামাটি-ইট। গাছের গোড়ার ফাঁকে ফাঁকে লতাপাতা পচা উর্বর মাটিতে অন্তত কয়েক বছর চমৎকার ফসল ফলতো। নদীর বাইরে, জলেভাসা জমির বাইরে চাষবাসের আরেকটা ধারা গড়ে ওঠে—যেটাকে জুম চাষের আদিরূপ বলা যাবে।

এইবারে মানুষ নিজেদের বাড়ি বানাবার কাজে লাগে। দল বাড়ছে, দল এদিক ওদিক যেতে পারে, এর জমি ওর জমি নিয়ে হাঙামা হয়। কাজেই সামাজিক বন্ধন, গোষ্ঠী বন্ধন শুরু হলো। তারা খুঁটি পুঁতে,

কাঠামো সাজিয়ে,সরুডালে মাটির প্রলেপ দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস বাড়ি করল। ডালের বুনোট দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করাটা বাবুইবাসা দেখে মানুষ শিখেছে —নিজের বাসাতেও বুনোটের কৌশলটা খাটালো। গ্ল্যাস্টনবেরি ক্যাথেড্রালের অভ্যন্তরে যে বেদীগৃহ এখনো আছে সেটি এই পদ্ধতিতে তৈরি। বহু শতাব্দী ধরে এই ঘরটি একই ভাবে তৈরি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে—তার কারণ লোকের বিশ্বাস হলো এই গৃহে একদা যীশু খ্রীষ্ট বাস করেছিলেন।

কাদামাটি পুড়িয়ে নিয়ে যে মৃৎপাত্র এল, তার ব্যবহার হলো এই গৃহে। গম যবের মণ্ড রান্না করা সহজ হলো—আর এই খাদ্য হলো শিশু ও বৃদ্ধদের। গাছের ছাল-বাকল তুলতে গিয়ে তারা তন্তু পেল, তাছাড়া ছিল পশম। উদ্ভিজ্জ উপাদান খুঁজে পাওয়া গেছে—হাতে এসেছে শর্করা, তেল আর প্রোটিন। চাষের খড় জমিয়ে রাখা হলো, শীতের জন্য পশুর খাদ্য হিসেবে। খানিকটা নিরাপত্তা, সুখী গৃহ-কোণ পেয়ে মানুষ অন্য কাজে মন দিতে পারে, গড়ে তুলতে পারে মৃৎপাত্র, বস্ত্র বয়ন —এগুলো হাতে নিল মেয়েরা। আর পুরুষরা হাতে নিল কৃষিকর্মের ভার। আর অল্পবয়সীদের হাতে এল পশু চারণ। শ্রমের বিভাজন তৈরি হলো। তবু তখনো মৃগয়া বা শিকার থেকে যাচ্ছে। হাতিয়ার তখনো কুড়োল, বর্শা, তীরধনুক এবং হাতুড়ি। হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙে বড় বড় চাঁই বয়ে আনলো মানুষ—তা দিয়ে দেয়াল বা মন্দির-টন্দির তৈরি করলো। যে আকারে পাথর কাটায় পরিশ্রম কম, ঠিক সেই আকারে তারা পাথর কেটেছে—এটা একটা অদ্ভুত বিস্ময়। এই বিস্ময়কেও সহজে আয়ত্ত করলো মানুষ।

আরেকটা অদ্ভুত জিনিস মানুষ লক্ষ্য করে ; সব ফল-গাছের কাঠ শক্ত। খেজুর জাতীয় গাছ ছাড়া অন্য সব কাঠের তন্তু বিন্যাস সূক্ষ্ম, চমৎকার ; পরিণত গাছে ফল বেশি হয়, তবু ফলের ভারে কাণ্ডটি অক্ষুন্ন থাকে— প্রকৃতির নিয়ম এই ! মানুষ এই নিয়মটিকে জেনে জানলো, এই কাঠ শক্ত আর নমনীয়, বনের কাঠের চেয়ে গৃহের কাজে এই কাঠ অনেক উপযোগী। এই কাঠ এল কৃষিতে, মানুষের গৃহস্থালীতে।

একই রীতি মিশর ছেড়ে মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু অববাহিকা বা চীনে দেখা গেল। আর দেখা গেল নদীতে জমি ভাসলেও, সব মাটি মিশরের নীল নদীর মত পলিভরা নরম নয়। জলভরা জলভাসা জমি কুপিয়ে নিতে হয়—শুধু কাদামাটি সরল করলে চলেনা। কোপানো হবে কি করে? বাইসের পরিবর্তিত চেহারার কোদাল এল, শাবলও এল। তবু শাবল আর কোদাল দিয়ে দ্রুত কাজ করা গেলনা। এক টুকরো জমি চষতে অনেক শাবল, অনেক কোদাল লাগে। এত কোদাল-শাবল তৈরি করা কি সহজ কথা। একটা বাইস করতে সে যুগে একটা মানুষের কয়েক মাস লাগতো। সেখানে এত হাতিয়ার করা সহজ নয়। হাতের কাছে পাওয়া ঝোপ-ঝাড় দাবিয়ে রাখা গেলেও সহজেই জমি অনুর্বর হয়ে যায়; জুম চাষ মানে ছোটাছুটি; একজায়গায় থাকা নয়। একজায়গায় থাকতে হলে জমি চষতে হবে—মই দিলেই চলবেনা।

সমস্যটা বেশি দেখা দিল মেসোপটেমিয়াতে। সেখানে দুটো নদী তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস। দুটো নদীর দুধার আর মাঝের অববাহিকাটুকু চাষবাসের ভারি উপযোগী। তাছাড়া মেসোপটেমিয়ার লোকেরা দুটো নদীকে খাল কেটে মিলিয়ে জুলিয়ে ঝুড়ি বোনাবার রীতিতে এক আশ্চর্য জল সেচন পদ্ধতি আনলো। সে এক আশ্চর্য ইঞ্জিনিয়ারিং যা আজকের দিনে, অনেক জানার পর, এ যুগের কলাকুশলীরা দেখে এর চেয়ে ভাল জল সেচের রীতি আর কিছু হতে পারে না। ইরাকী সরকার তাই সেই পুরনো জল সেচের রীতিটি ফিরিয়ে আনতে চাইছেন।

এই সময়ে জমি চাষের উপর মেসোপটেমিয়ানরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একটা যন্ত্র দরকার যা হবে শাবল, যা হবে কোদাল, আবার মই দেওয়ার কাজে লাগবে, আর যাকে দ্রুত ব্যবহার করা যাবে। যন্ত্রের আধিক্য নয়, যন্ত্র হবে উপযোগী। আর এই নিয়ে ভাবতে গিয়ে মেসো-পটেমিয়াতে এল লাঙল। লাঙলের ফলা হলো শাবল যেন, কাটার ভঙ্গিতে আছে কোদালের চোট, টানার পথে আছে কাদামাটি সমান করে তুলে ধরা মই দেওয়ার ইশারা। লাঙলের ফলা চাপা দেবার জন্য রইল মানুষের শরীরের ওজন—যে আবার লাঙলটির পরিচালন-নিয়ন্ত্রণ করবে;

আর লাঙল টানে অন্য কেউ। আগে টানতো মানুষ। পরে এলো পশু। পশুদের মধ্যে বলদই প্রথম লাঙল টানতে এল। বলদরা বলদ বলেই তাদের নিয়ন্ত্রণ সহজ। তাছাড়া ছিল মেসোপটেমিয়াতে পাওয়া ছোট গাধা, টাট্টু ঘোড়া ইত্যাদি। ঘোড়াও জোতা হলো। তবে ঘোড়ার লাগাম পরানো সহজ হলো না। আনুমানিক চারশ খ্রীষ্টাব্দে চীনরা ঘোড়ার মুখে লাগাম পরানোর সঠিক রীতিটি পেল। আরবদের হাতঘুরে ইউরোপে সেই রীতি আসে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে লাঙল টানা সব জমিতেই হয়েছে। কারণ লাঙল হলো মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে তোলার, মাটি চাষের জন্য নরম করার পদ্ধতি। এর সঙ্গে মিশে গেল চাষের জমিতে গৃহপালিত পশুর গোবর সার দেয়া। বাস। মানুষ হলধর হয়ে জলধর নদীর ধারে বসে অবসর কালে সূর্য-শশধর দেখতে আরম্ভ করে!
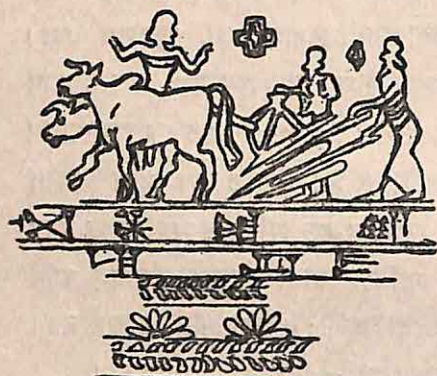
ব্যাবিলনে চাষের দৃশ্য

লাঙল শুধু যন্ত্র যুগের সূচনা করলো না। লাঙল হলো—আকাশ দেখা—গতি দেখার যন্ত্রণার শুরু।

লাঠি হাতে মশাল নিয়ে হলধর মানুষ সত্যিকারের যন্ত্র নিয়ে দাঁড়ায়—যে যন্ত্র লাঙল। যেখানে আছে টানার শক্তি, কোপানোর শক্তি নিয়ে ভাবনা—টানের জোর, কোপানোর জোর বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস। এক লাঙলে কয়েক হাজার বছরের হাতিয়ারের চিন্তার হাজিরা ধরা দেয়। হাতিয়ার যেন যন্ত্র হয়। তবু কেন এমন যে হলো তার নিয়ম তখনো মানুষের অজ্ঞাত।

লাঙলের ব্যবহারে ফলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা মানুষকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। পাথরের ফলা ভেঙে যায়, গড়তে সময় লাগে, তাছাড়া তার আকারটা ঠিক ইচ্ছামত করা যায় না। লাঙল আর চাষবাস মানুষকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে ভাবাতে পারলো। তবু মানুষের ছোটাছুটির তখনো বিরাম ছিল না। নৌকো করে সাগর পারাপারের চেষ্টা এ যুগে তারা করেছে ; তেষ্টা থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নৌকো ভর্তি নারকোল নিত। আর সে নৌকো তো ছোট খাটো নয়, সে হলো বাইবেলের নোআর আর্ক—তার জাহাজ। একেকটা যেন ভাসমান খামার বাড়ি—সেখানে থাকতো কুকুর, শুয়োর, মোরগ বা অন্য কিছু। মেয়েরা জাহাজে মিষ্টি আলুর কন্দ বুকের গরমে চেপে রাখতো, তাতে বুকের ওমে বীজ-গুলো জীবন্ত থাকে। চাষের বীজ, খামারের পশু—এ সব নিয়ে মানুষ উপনিবেশ গড়তে বেরিয়ে পড়ল। উপনিবেশ গড়লো। সেখানে হয়তো গরু ছিল না। না থাকুক ; লাঙল ছাড়া নিড়ানি দিয়ে চাষ করতো। আর এই যুগে, আজ থেকে হাজার পাঁচেক বছর আগে, মানুষ মাটির পাত্র গড়তে শিখে গেছে, পোশাকও বানাতো। পোশাক বানাতো হাড়ের ছুঁচে। আর যে কোনো মশলা ছাড়া পাথরের উপর পাথর বসিয়ে বাড়ি বানালো—যে বাড়িতে জানালা নেই ; তারও সূচনা এ যুগে। শুধু গাঁওবুড়ো বা রাজার বাড়িতে কাঠের প্যানেল থাকতো।

সমুদ্র পার হয়ে হাওয়াই-পলেনেসিয়া দ্বীপে যেমন হাতুড়ি-কুড়োল নিয়ে মানুষ ভেসে এল, তেমনি তারা গেল তুষার অঞ্চলে। এখানে তুষার দেশের মানুষ এস্কিমোরা বানালো স্লেজগাড়ি—চাকা নেই, মসৃণ বরফের উপর সরসর করে কেমন যেতে পারে। তাদের গৃহপালিত জন্তু হলো কুকুর আর বলগা হরিণ। জ্বালানি কাঠ সেই রাজ্যে নেই। তারা তাতে পিছপা হলো না। চর্বি দিয়ে ঘর আলো-গরম করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করল। সোপস্টোন খোদাই করে বাতি বানালো, বানালো কেটলি বা জলের পাত্র। বাতির আলোয় খাবার সিদ্ধ করেছে। উপকরণ

বলতে কাঠ পাথর হাড় নয়, এদের উপকরণ চর্বি-পাথর আর হাড়। যেটুকু কাঠ তারা পেল, তা লাগালো বরফের জুতো বা স্লেজগাড়ি করতে।

রাঁধা বা আলো তাপের জন্য তেলের ব্যবহার এস্কিমোদের হাতে। আর বয়ন শিল্পে তারা আমাদের থেকে এগিয়ে গেল। মোটা চামড়ার পোশাক মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে জুতো—বারো খণ্ডের এস্কিমো পোশাক, বানানো চাট্টিখানি কথা ছিল। এই কাজ এস্কিমো মেয়েরা করতো—করতো হাড়ের ছুঁচ আর ঘষা স্লেটের ছুড়ি, যার নাম উলু (ULU) তা দিয়ে। আর উলু-ছুড়ি ধীরে ধীরে তুষার অঞ্চল থেকে ছড়িয়ে গেল। হাতুড়ি কুড়োল ছুঁচের সঙ্গে এল চামড়া সেলায়ের অন্য হাতিয়ার—উলু।

এই সময়ে হঠাৎ মানুষ তামার খোঁজ পেল। উত্তর-পশ্চিম কানাডাতে করনেশন উপসাগরে ওরা তামা পেল—প্রায় মৌলিক তামা। তবে তামা নিয়ে এস্কিমোরা ভাবনা করল না। তাদের হাতিয়ারে রইল ফ্লিন্ট, রইল হাড় আর সোপস্টোন। ভেসে আসা কাঠ দিয়ে তৈরি করল স্লেজ, জুতো, চামড়া দিয়ে পোশাক, তাঁবু, নৌকোর আবরণ, ধনুকের ছিলা, সেলায়ের দড়ি। প্রাণীর অন্ত্র দিয়ে করল টুপি আর বর্ষাতি; হাড় আর দাঁত খোদাই করে স্লেজের ঘূরণদণ্ড, জোর, টগল আর হারপুনের সকেট।

টগল আর সকেট—এ দুটি যান্ত্রিক রীতি হয়তো একই সময়ে অন্যত্র দেখা দিয়েছে। তবু এদের অসামান্য ব্যবহার হলো এস্কিমোদের হাতে। হাড় দিয়ে চ্যাপ্টাফালি করে পাতটাকে জড়িয়ে এরা স্প্রিং বানাতো। স্প্রিংটাকে চর্বির টুকরো দিয়ে জড়িয়ে নেকড়ের যাতায়াতের পথে রেখে দিতো। নেকড়ে যদি সেই চর্বি টুকরো গিললো তবে রক্ষে নেই—পেটের মধ্যে চর্বি গলে যায়, হাড়ের ফালি সোজা হয়। নেকড়ে মারা যায়। স্প্রিং এর ব্যবহার হলো নেকড়ে মারতে!

আর টগল হলো আলগা মাথা হারপুন। হারপুনের এক প্রান্তে থাকে ধারালো তীক্ষ্ণ মুখ আর অন্য দিকটা গোলাকার। এই গোলাকার

অংশটা একটা লম্বা কাঠের সকেটে ঢুকিয়ে নেয়া হলো। হারপুনের ডগায় বাঁধা থাকে দড়ি। হারপুন ছোঁড়া হলো—শিকারের গায়ে তীক্ষ্ণ ফলা ঢুকে যায়, আঘাতের প্রাবল্যে সামনের দণ্ডের মাথা থেকে ফলা খুলে যায়। দড়ি বাঁধা ফলক শিকারের দেহে আটকে থাকে, আর ভেসে থাকে দণ্ড। দণ্ডকে তুলে নেয়া হয়, আর ক্লান্ত শিকারকে মাছধরার মত খেলিয়ে খেলিয়ে পাড়ে টেনে তোলা হয়। টগল আর বল-সকেটের ব্যবহারে সীল মাছ ধরা গেল! আর তিমি সিন্ধুঘোটক তুলতে দরকার হলো উইঞ্চের মত কপিকল। টগলের রশির সঙ্গে দাঁতের তৈরি একসার পুলি বা কপিকল বেঁধে দিল তারা। পুলির তত্ত্ব না জেনে অনেক পুলি দিয়ে অল্প জোরে যে ভারি মাল তোলা যায়, সেটা তারা প্রয়োগ করলো। অনেক পরে, প্রায় সাড়ে চারহাজার বছর পর, গ্রীসের হিরো পুলির প্রাথমিক তত্ত্ব বের করলেন। ততদিনে এস্কিমোরা কোনো কিছু তত্ত্ব না বুঝেই কয়েক লাখ তিমি সিন্ধুঘোটক মেরে বসে আছে। এস্কিমোদের টগল আর পুলিতত্ত্বের নিয়ম খুঁজে গ্রীক হিরো নায়ক হিরো হলো—আর যে এস্কিমো এটি তৈরি করলো—তার হদিশ ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকলো না!

এস্কিমোরা আরেকটা কাজ করল গম্বুজ গড়া। তাজমহলের গম্বুজ, প্ল্যানেটোরিয়ামের গম্বুজ, যতো গম্বুজের কথা ভাবা যাক না কেন এস্কিমো-দের ইগলু গম্বুজ এককথায় অতুলনীয় অনন্য। বরফের ক্রমসূক্ষ্ম পাটা চক্রাকারে বসিয়ে গম্বুজ তৈরি হলো। প্রত্যেকটি পাটা তার পাশের আর নিচের পাটার সাহায্যে খাড়া থাকে। শেষ কালে মাথার উপর যে ফাঁক বা ছেঁদা থাকে তাকে ঢাকা হলো আস্ত এক পাটা দিয়ে। ইগলু হলো গোল, একবারে গোল। যেন একটা স্ফিয়ারের অংশ। অন্যদিকে ইরান-তুরানের গম্বুজ গড়া হলো পাথর-ইট দিয়ে। এখানে গম্বুজের ভিত্তি হলো চারটি চারটি এক সঙ্গে লাগা জোড়া খিলান। এক ধাপ খিলানের উপর গড়ে তোলা হলো আরো একধাপ খিলান—যেন সার্কাসের খেলোয়ারের কাঁধের উপর দাঁড়ানো। অস্থায়ী ঠেস ছাড়া এস্কিমো আর পারশিকরা গম্বুজ গড়তে পারলো।

ঠিক এইসময়ে মিশর মেসোপটেমিয়ায় তৈরি হলো পিরামিড। চক্রাকার নয়, চতুর্ভুজ বা ত্রিভুজাকার ভূমির উপর ধীরে ধীরে বড় থেকে ছোট হতে হতে আরেক ধরনের আকার। স্ট্রাকচারাল আর আর্কিটাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্রেফ নকশা অঙ্ক ছাড়া মানুষ গড়ে তুললো। তখনো হাতিয়ার কুড়োল, কুঠার, কোদাল, শাবল, হাতুড়ি। তখনো চাকা আসেনি।
আর এই কারিগরি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রাথমিক সূচনায়, আরেকটা কাজ মানুষ করে—সে হলো চুল্লি। এস্কিমোদের মত তেলের আগুনে জলফোটানো নয়। মাটি দিয়ে গড়া, পুরোপুরি ঢাকা, শুধু ইগলুর মতো বায়ুর চলাচল পথ-রাখা চুল্লি, যাকে বলা যাবে ফার্নেস। চুল্লির তাপ পাওয়া যেত ১০০০° থেকে ১২০০° ; তাতে রুটি হতে পারতো ; এই কিলেন বা চুল্লিতে মাটির পাত্র পোড়ানো যেত। প্রথম যুগে কাঠ দিয়ে জ্বালানো খোলা উনুনে কম তাপে মাটির পাত্র পুড়িয়ে দেখা গেল, অনেক পাত্র আধপোড়া নরম থাকে ; আর পাতলা পাত্র হলে তারা বেশি পুড়ে যেত। মোদ্দা হরে দরে দুটোরই এক ফল—সে সব পাত্র সহজে ভেঙে যেত। এই গোলগাল চুল্লি গড়ে ওঠার ফলে পুরু খোলার মৃৎপাত্র সমানভাবে পুড়তো।
ইগলুর গম্বুজ এস্কিমোদের গরম রাখতো—তাদের অভ্যন্তরের তাপ সমান ছিল। ঢাকা গোল চুল্লির অভ্যন্তরের তাপ সমান থাকে। পোড়া পাত্র হলো শক্ত। গাধার পিঠের ঝাঁকানিতে অথবা অসাবধানে ওঠানো নামানোতে ভাঙতো না। পাথরের পাত্র দিয়ে যেমন ইচ্ছে আকার গড়া যেত না। মাটির পাত্রে আকারের হের ফের ঘটে। প্রয়োজনের সঙ্গে শিল্পবোধ দেখা দেয়। পোড়ামাটিকে জুমচাষের কালে মানুষ দেখেছিল। এবার অন্য চোখে দেখে। এ দেখা কত সুন্দর ! কত আশ্চর্যের !

(৮) অয়স্কঠিন ব্রত

কৃষি কাজের প্রথমে যে লাঙল ব্যবহার হলো, তার ফলা ফ্লিন্টের। আর তারপর কোনো এক সময়ে ধাতু বা ধাতুর আকর পাথরের সন্ধান

পাওয়া গেল। মিশরে রাজকীয় একটি বিভাগ ছিল—তার কাজ ছিল মরুভূমি থেকে পাথর আন। আর খনিজ তোলার ব্যবস্থা করা। তবে সে পরের কথা। তার আগে পুরোহিতের দল কোন্ পাথরে কী যে হতে পারে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পথ ধরে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে পড়ে। চুনা পাথর দিয়ে তৈরি হলো পিরামিড, মূর্তি ইত্যাদি। পালিশের বা চাঁছাছোলার জন্য অথবা প্রদীপ তৈরি করতে লাগল অ্যালবাস্টার পাথর, আরো কঠিন কালো পাথর ডাওরাইট আর পরফাইরি দিয়ে তৈরি হলো মূর্তি; লাল গ্রানিট দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ। পাথর খুঁজতে মিশরীয়রা তামা আর সোনা পেল, কারণ এ ছুটো ধাতু মৌলিক রূপে ঊর্ধ্ব স্তরে অবক্ষেপ আকারে পাওয়া যেত। এখন অবশ্য সেই আনন্দ আর নেই; কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ এসব সোনা তামা মুঠো মুঠো কুড়িয়ে খরচ করে বসে আছে! হাজার পাঁচেক বছর আগে হাতুড়ি দিয়ে পিণ্ড থেকে টুকরো টুকরো ধাতু পৃথক করে নেয়া হতো। এই ব্যাপারটা সুবিধের না—তামা পেটাতে গেলে ভেঙে যায়। কাজেই ধীরে ধীরে তৈরি হলো তামা গলানোর রীতি। যে চুল্লিতে ইঁট পোড়ানো হলো একই চুল্লিতে তামা গলানো হতো। গলা তামা দিয়ে নানা আকারের বস্তু তৈরি করা সহজ হলো। তামার অস্ত্রও এল।

তামার আকর খুঁজতে গিয়ে পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অন্য ধাতুর খোঁজ পেল মানুষ। এল টিন, রুপো বা দস্তা। ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে মিশর থেকে দূরে কোন একদল তামা-টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ পেলো; তামার থেকে অনেক অনেক শক্ত, আর ঢালাই করা সহজ। অতি দ্রুত পাথর হঠিয়ে ব্রোঞ্জ যেমন হাতিয়ারের উপকরণ হলো, তেমনি হলো শিল্পের উপাদান। ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ব্রোঞ্জ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আর তখনো ধাতু গলানোর জন্য প্রাচীন চুল্লিই যথেষ্ট। সুমিরিয়ানদের দেশে মেসোপটেমিয়ায় কাদা মাটি ছাড়া কোন ধাতুই পাওয়া যেত না। তা সত্ত্বেও বাইরে থেকে তামা-টিন ইত্যাদি এনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা শিল্প দ্রব্য তৈরি করে বাণিজ্যের পথে সুমিরিয়ানরা বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিল। বাণিজ্যে যে লক্ষ্মীর বসত তার প্রাচীন উদাহরণ হলো সুমেরি-

য়ানরা। তারা যেন এ যুগের জাপান—অন্য জায়গা থেকে উপকরণ কিনে এনে নতুন নতুন মনোহারী বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করে জাহাজ ভাসিয়ে নানা জায়গায় বিক্রি বাঁটরা করে নিজেদের অবস্থা সচ্ছল করে তুলেছিল। বড় পরিশ্রমী ছিল এরা। তাছাড়া একই সময়ে মিশরে বা মেসোপটেমিয়ায় লিপি এল। মিশরের মৌল ব্যঞ্জনগুলো ফিনীশিয়রা সেমেটিক বর্ণমালায় রূপান্তর করে নিল, পারশিকরা সেগুলো কীলক লিপিতে রূপান্তরিত করল। ফিনীশিয় বর্ণমালায় গ্রীকরা স্বরবর্ণ যুক্ত করে নিল—তখন সে বর্ণমালা অন্য ভাষাতেও ব্যবহৃত হলো। অন্যদিকে মাল কেনা বেচায় রৌপ্য আর স্বর্ণমুদ্রার আদান প্রদান শুরু হলো। বর্ণমালা আর মুদ্রা—এ দুটোর পথে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তবে সে অনেক পরের ব্যাপার। ইতিমধ্যে মানুষের হাতে লোহা এসে গেছে। তবু হোমারের কাব্যে যে যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে কিন্তু ব্রোঞ্জের অস্ত্রের ব্যবহারই যে ছিল—তা জানা যায়। লোহা এলেও তার চালচলন তখন টলমলে, হাঁটি হাঁটি পা-পা।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরু ব্রোঞ্জ দিয়ে আর খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের আরম্ভ লোহা দিয়ে। লোহা গলানোতে চুল্লির সমস্যা দেখা দিল। দুই কোঠার গোল চুল্লি থেকে রুটি সেঁকা, মাটির পাত্র পোড়ানো বা তামা টিন গলানো সহজ ছিল—তাপ পাওয়া যেত হাজার থেকে বারশ সেন্টিগ্রেডে—তা যথেষ্ট। পাথরের মুচিতে করে তামা আগুনে বসালে তামা গলে যায়, ঢালাই টালাই বেশ হতো। এই পদ্ধতি লোহাতে চলল না। লোহা গলে ছশ থেকে সাতশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। কিন্তু আকরিক পাথর থেকে যে লোহা পাওয়া যায় তা ধাতু-মলে ভরা, নোংরা। একে ঢালাই করার জন্য গলাতে গেলে যে তাপ দরকার তা প্রায় সাড়ে পনেরশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ব্রোঞ্জ যুগের চুল্লিতে তা অসম্ভব। আদি কর্মকাররা প্রথমবারের গলানো লোহাকে বার বার তাপে ফুটিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ধাতু-মল মুক্ত করতো। আর তারপর হঠাৎ তারা আবিষ্কার করে এক বিশেষ ধরনের এক কোঠার চুল্লি যেখানে লোহা গলানো সহজ। লোহার আকর সোজাসুজি কাঠ কয়লার উপর বসানো হলো আর মেশানো

হলো চুনাপাথরের গুঁড়ো। লোহার ধাতুমল সিলিকা চুনা পাথরের সঙ্গে মিশে লোহা থেকে আলাদা হয়ে সরে দাঁড়ায়। আর এই রীতিতে ৭০০° সে' র মধ্যে লোহা গলানো গেল। তামা ব্রোঞ্জে যে তাপ লাগতো তার চেয়ে অনেক কম এর তাপ। আরেকটা জিনিস হলো, তপ্ত লোহা যদি ১১০০—১২০০° সে' তাপে হাপরের কাঠ কয়লায় রেখে পরে পেটানো আর জলে চুবানো হয় তবে সেই লোহা ইস্পাত-কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হাপরের ব্যবহার এর আগে মানুষ জেনেছে। চামড়ার মসকে দুধ ভরে দুধ নাড়িয়ে মেয়েরা দুধ থেকে মাখন তুলতো। দুধ ফেলে দেবার পরেও দেখা যেত মসক ফুলে থাকে, টিপে ধরলে ফোঁস করে হাওয়া বেরিয়ে আসে। বাস—ঐ মসক থেকে মানুষ তৈরি করল হাপর।

লৌহ যুগে আকস্মিক ভাবে ইস্পাত পাওয়া গেল। পাওয়া গেল স্প্রিং ইস্পাত। অনেকে ভাবেন দামাস্কাস হলো এই ইস্পাতের জন্মভূমি। তা নয়, এখান থেকে জিনিস তৈরি করে অন্যত্র চালান হতো—ইস্পাতের এই বিশেষ রূপটি উৎপন্ন হতো ভারতবর্ষের গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে, অধুনা হায়দ্রাবাদে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। যে পদ্ধতিতে এই ইস্পাত হতো তাকে বলা হয় উৎস (WOOTS)। এরা যে ইস্পাত করত তা বড় জোর এক কেজি ওজনের। এই সব খণ্ড আফ্রিকার পথে সুদূর রোমে হাজির হতো। আরবদের ভারত চেনার পর তারা ঐ সব ইস্পাত খণ্ড দামাস্কাসে নিয়ে এক শিল্প-নগরী গড়ে তুললো—ভারতের লোহা কিনে আরবরা দ্রব্য তৈরি করে ইউরোপের বাজার দখল করে নেয়। দামাস্কাসের হাতিয়ার অস্ত্রের তখন ভারি সুনাম। আরবরা এরপর লুকিয়ে চুরিয়ে ভারতের উওৎস পদ্ধতিটি শিখে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। ভারতের ইস্পাতের বাজার বিশ্বাঘাতক আরবদের হাতে মার খায়!

তবু ইস্পাত পিণ্ড হলো ছোট খাট, কয়েক কেজির বেশি ইস্পাত এইসব পদ্ধতিতে পাওয়া গেল না। না যাক, সেই ইস্পাতে নুরেমবার্গ সহরে হাইনলাইন প্রথম স্প্রিং চালানো ঘড়ি আবিষ্কার করেন ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে।

এই ইস্পাত হলো যন্ত্র যুগের শুরু। নানা হাতিয়ার মানুষের হাতে এল।

তারা শক্ত, তীক্ষ্ণ, ঘাতসহ, হালকা। পৃথিবীর ধাতুর প্রায় এক চতুর্থাংশ হলো লোহা। লোহা পাওয়া যায় বেশি। লোহার হাতিয়ার সব মানুষের কাছে চলে আসে। বর্ণমালা-মুদ্রা-আর লোহা বা ইস্পাত এই তিনের সঙ্গে যোগ দেয় আরেকটি আবিষ্কার—চাকা। আর তারপর মানুষ চাকার পথে যন্ত্র যুগে গড়িয়ে চলে আসে।

(৯) লেখালেখির পালা

কথার ভেলার টানে মানুষ পারিপার্শ্বিক প্রাণজগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেল। তারা পুরানো কথা ধরে রাখে, গল্পগুজব করে। সেই গল্প, পুরাণ কথা এক মুখ থেকে অন্য মুখে ছড়িয়ে যায়, এক কাল থেকে অন্য কালে ধরা পড়ে। এই সব কথা হলো শ্রুতি বা শোনার, কারণ স্মৃতি থেকে মানুষ এদের বলে যায়। যারা এই সব গল্প বলতো, মনে রাখতো সেই কথকরা-পুরাণবিদ্‌রা গোষ্ঠীতে সম্মানের আসন পেত। তবু এক জন থেকে অন্য জনের গল্পের প্রবাহ ভেসে যাবার কালে, গল্পের পরিবর্তন ঘটতো। এই পরিবর্তন দু ভাবে ঘটেছে—কেউ 'পার্বতীসুতো লম্বোদরঃ' শুনতে শুনেছে 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর' অথবা কেউ গল্পকে পরিবর্ধন পরিমার্জন করে বিশদ রূপ দিল। প্রথম দিকে এ নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়নি। তারপর মানুষ যখন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে, ভিন্ন গোষ্ঠীতে বদ্ধ হয়, তখন গল্প নিয়ে, গোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে গোলমাল জাগে। তখনই ভাবনার শুরু—কথাকে নির্দিষ্ট বাঁধনে বেঁধে কি রাখা যায়? গৃহপালিত পশুর মতো কথার রূপকে আটক করা যাবে কি?

ইতিমধ্যে মানুষ ছবি এঁকেছে। কেন এঁকেছে তার হদিশ কিন্তু জানা নেই। শিকার করতে যাবার আগে মনোবাসনা ব্যক্ত করেছে ছবিতে, শিকার ভাগ করার আনন্দ ফুটিয়েছে ছবিতে। এই ছবি তখন একটি ছোট গল্প—একলাইন বা দুইলাইনের কথকতা। তবু ছবি আঁকা অনেক সময় সাপেক্ষ। পুরো পশু-মানুষের ছবি থেকে মানুষ সংকেত টানলো। মানুষ দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এত না এঁকে আঁকলো মঙ্গলঘটের

সংক্রান্তি পুরুষের আলপনা। আর এই সাংকেতিক চিহ্ন আঁকতে গিয়ে মানুষ ছবির হরফ গড়ে তোলে। সেই হরফ গড়ে ওঠে আজ থেকে দশ-বারো হাজার বছর আগে—যার নিদর্শন আছে মিশরের হরফে। ছবির হরফে মিশরীয়রা বাক্য রচনা করে, রাজা-পুরোহিতের নির্দেশ জানায়, গল্পও লেখে। প্যাপিরসের পাতায় মিশরীয়রা ছবির হরফে তাদের কথা লিখে গেল। এই হরফ সৃষ্টির সময় তারা উচ্চারণের সঙ্গে ছবির মিলের সূচনাও করে।

তবু উচ্চারণ থেকে হরফকে নিশ্চিন্ত মিলিয়ে যারা দিল, তারা মেসোপটেমিয়ার সেমিটিক গোষ্ঠীর দল-উপদল। সেমিটিকরা প্যাপিরসে-গাছের ছালে লেখেনি, তাদের ওখানে পাথর নেই। মাটির টালিতে লেখা। নরম মাটিতে লেখা বলে ছবির বিস্তৃতি আনা যায় না। তারা চিহ্ন আঁকড়ে নিল। ক'য়ে কাকাতুয়া, খ'য়ে খরগোশ—এই শব্দ আমাদের জানা। ক'য়ে কাক না বলে কাকাতুয়া বলি, কারণ কাকাতুয়ার মাথার ঝুঁটি তাকে অন্য পাখিদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখে ; তেমনি খরগোসের কান, গরুর শিং বা ঘোড়ার ল্যাজ। সেমিটিকরাও অক্ষরের রূপে নির্দিষ্ট প্রাণীর বা বস্তুর চিহ্ন আনলো। ইতিমধ্যে মিশরীয়দের কাছ থেকে শব্দের ভাঙাভাঙিতে অক্ষর যে পাওয়া যায় সেই নিয়ম কাছে-পিঠের সকলেই জেনে গেছে। আর জানা গেছে কতকগুলো অক্ষরকে আশ্রয় করে অন্য অক্ষরগুলো পালটায়—সেই সব অক্ষর হলো স্বরবর্ণ। সেমেটিকদের বর্ণমালায় স্বরবর্ণের প্রবেশ ঘটলেও, তাদের ভাষা এত ব্যাঞ্জনবর্ণবহুল, যে স্বরবর্ণের সংখ্যা বেশ কম। যেমন ইংরিজি বর্ণমালায় ছাব্বিশ অক্ষরের মধ্যে পাঁচটি স্বরবর্ণ, আর তাদের স্বরবর্ণের উচ্চারণে নানা বিকৃতি—সেই একই ট্রাডিশানের মূলে সেমিটিক বর্ণমালা দাঁড়িয়ে থাকে। সেমিটিক উচ্চারণের স্মৃতি আছে আরবী ভাষায় যেখানে সদ্‌র্, বহ্‌র্ জাতীয় শব্দে হসন্ত উচ্চারণ প্রচুর। আবার আরবী হা স্বরবর্ণের উচ্চারণ ই, ঈ, এ, ইত্যাদি হতে পারে ; কেতাতুরস্ত্‌কে কিতাতুরস্ত্ বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। স্বরবর্ণ নিয়ে সেমেটিকরা খুব একটা ভাবাভাবি করেনি—কারণ তাদের ভাষায় স্বরবর্ণ উচ্চারণ নেই। তাদের

অক্ষরও হলন্ত যেমন, আলেফ্-বেথ-গিমেল্-ডালেথ্। আর যখন ফিনীশিয় বণিক মারফৎ উত্তর সেমিটিক বর্ণলিপি গ্রীকদের কাছে এল, তখন তাদের নিজস্ব উচ্চারণ রীতিতে সেমিটিক বর্ণমালার স্বরান্ত উচ্চারণ ঘটে ; পাওয়া গেল আলফা-বিটা-গামা-ডেল্টা ! মজা হলো, সেমিটিক হরফ তৈরি হয়েছিল প্রাণী বা বস্তুর বিশেষ চিহ্নকে মনে রেখে। গ্রীকরা তাদের চিহ্ন নিল, অক্ষরের নামটাও নিল। তবে দুটোই পরিবর্তন করে নেয়। তাদের অক্ষরের প্রথম দুটো আলফা-বিটা কে নিয়ে বর্ণমালার জন্য শব্দ তৈরি হলো আলফাবেট। তবে এই আলফা-বিটা মূল আলেফ্ বেথ্ থেকে কত আলাদা।

হিব্রু ভাষায় আলেফ্ অর্থ ষাঁড়—যার দুটো খাড়া শিং। নর্থ সেমিটিক আদি অক্ষরে আলেফের চিহ্ন ছিল K। হিব্রু চিহ্ন হলো ∀। দুটোতেই প্রাণীর মুখের দুপাশে শিং-এর আদরা। এই চিহ্ন নানা জায়গায় নানা হরফে ঘুরপাক খেতে খেতে গ্রীক আলফার রূপে দাঁড়ায়—যার চিহ্ন A। হিব্রু চিহ্নের সোজাসুজি উলটো। হিব্রু বেথ্ হলো বাড়ি—গাছের উপরে টং বাড়ির আদলে হরফ হলো 9 ; আর এই চিহ্ন নানা সেমিটিক অক্ষরে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় ਬ তে। আর একেবারে ঘুরে গ্রীক বর্ণে B চিহ্নে বিটাকে পাওয়া যায়। গিমেল্ মানে উট—লম্বা গলা পশুর চিহ্ন 7—আর গ্রীক গামা হলো Γ ! বন্ধ দরজা হলো ডালেথ্ যার চিহ্ন সেমিটিকে ছিল সমকোণী ত্রিভুজ । আর গ্রীকে ডেল্টা হলো সমবাহু ত্রিভুজ △।

টাও মানে মার্কা যা ছিল ঢ্যারা চিহ্ন × ; এটি রূপ নেয় যোগ চিহ্ন + যা উত্তর সেমিটিক অঞ্চলে দাঁড়ায় ক্রশ চিহ্নে † এবং টাও অক্ষর গ্রীসে হলো T—সাজানো টি চেনাজানা ছকে দাঁড়ায় ! অক্ষরগুলো উলট পালট খাচ্ছে শুধু চিহ্নে। অন্যদিকে তাদের নামটা পালটালেও, মূল সুরটা থাকছে—যেমন কৃষ্ণ হয় কানু। তেমনি নামের বেলা তৎসম-তদ্ভব ব্যাপার যেন। ঐ একই ব্যাপারটা টানা যায় বর্ণলিপিতে। এখানে এক লিপি অন্য ভাষায় নিপাতনে যেন সিদ্ধ ! সেমিটিক বর্ণলিপিতে রেখার প্রাদুর্ভাব, আবার আরবী লিপির মূলে থাকে বর্তুলতা আর ঢেউ।

তার কারণ হলো লেখার জন্য যে কলম বা স্টাইলাস আর যে পাতা ব্যবহার করা হচ্ছে—তার উপর নির্ভর করে অক্ষরের রূপ। ভারতবর্ষে ভূর্জ পত্রে খাগের কলমে যে হরফ লেখা হলো তারা কৌণিক, যেমন দেবনাগরী; অন্যদিকে কলাপাতা বা তালপাতায় লেখা হলে কোণকে সরিয়ে বর্তুলতা আনতে হয় বলে দক্ষিণ ভারতের বর্ণলিপি গোলাকার! এখানেও সেই বৃত্তান্ত। আবার লেখা যে ডান বা বাঁদিক দিয়ে শুরু হবে—সে নিয়ে প্রথম দিকে খুব একটা আঁটসাট নিয়ম ছিল না। ডান থেকে শুরু করে পাতার সীমায় এসে পরের লাইনে বাঁদিকে দিয়ে শুরু করা—আবার লাইনের শেষে ডাইনে মোড়—এ ধরনের লেখা আকছার দেখা দেয়। পরে অবশ্য সেমিটিক লিপি বাঁদিক থেকে ডাইনে আর আরমাইক লিপি ডান থেকে বাঁয়ে যাবার প্রথাসিদ্ধ রীতি মেনে নেয়।
সেমিটিক ভাষায় ছিল বাইশটি অক্ষর। গ্রীকে চব্বিশ। তার মধ্যে সেমিটিক HE (যার থেকে পাওয়া যায় আরবী হা, পার্শি হে) তা থেকে ভেঙে যে গ্রীক স্বরবর্ণ পাওয়া যায়—এপসিলন যার উচ্চারণ ই অথবা ঈ! সেমিটিক ইয়ড্ (YOD-যার মানে হাত)-তা থেকে পাওয়া গেল গ্রীক আয়োটা। ইয়ড্ ব্যঞ্জনবর্ণ অথচ আয়োটা স্বরবর্ণ! গ্রীকে **i** এর উচ্চারণ নেই, আছে **u** র উচ্চারণ যা **w** এর উচ্চারণের কাছাকাছি। শব্দমালায় গ্রীকে চব্বিশ অক্ষর, অথচ সংখ্যাতে ছিল সাতাশ। তবে ছাব্বিশ বর্ণের হরফ ছিল গ্রীসের কাছে—এশিয়া মাইনরে—লীডিয়াতে। লাতিন হরফ এল গ্রীকের পর, এখানে অক্ষরসংখ্যা তেইশ। আর ইংরিজি হরফের ছাব্বিশ এল লাতিনকে আশ্রয় করে; লাতিন **I** ভেঙে এল **i** ও **j** এবং v ভেঙে u, v, w, এই তিনটি। লাতিন বা গ্রীক হরফের একটু রকমফের রুনিক বর্ণমালা থেকে পাওয়া গেল জার্মান গথিক বর্ণমালা।
সেমিটিক হরফের প্রচার ভারতেও হলো। ব্রাহ্মী হরফ এল সেমিটিক বর্ণলিপি আশ্রয় করে আর আরমাইক লিপির রূপান্তরে এল পারসী হরফ। পারস্য আক্রমণে উত্তর পশ্চিম ভারতে যে পারসী ধাঁচের লিপি এল তাই খরোষ্ঠী। আরবী হরফে আজও আরমাইক হরফের চিহ্ন আছে যদিও খরোষ্ঠী হরফ ভারতে আর নেই। এই ব্রাহ্মী আর

খরোষ্ঠী লিপি কবে ভারতে এসেছে তা জানা যায় না। তবে ললিত বিস্তারে জানা যায় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ব্রাহ্মী আর খরোষ্ঠী হরফ শিখেছেন। আর মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আমলে কায়স্থেরা লেখার কাজ করতো--তাদের হরফ দেখে স্বয়ং চানক্য প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। বুদ্ধের জন্মের আগে সংস্কৃত ভাষা এসেছে—আর সে যুগের ভাষাবিদরা এই ভাষার অক্ষর তৈরি করতে এক আশ্চর্য বিজ্ঞান পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেন। স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণে বিভাজন হলো, স্বরবর্ণের উচ্চারণে বিকৃতি দূর করতে একাধিক স্বরবর্ণ এল, ই-ঈ উ-ঊ। আবার তেমনি র এবং ল এই দুই অক্ষরের স্বরধ্বনি নিয়ে হাজির হয় ঋ ও ঌ। এই র-এর স্বরধ্বনি আজও ইউরোপীয় স্লাভ ভাষায়—বিশেষতঃ চেক ভাষায় আছে—যেমন KRK এর উচ্চারণে R এর স্বরধ্বনি আছে এটি ঋ! সংস্কৃত ভাষার অক্ষরে উচ্চারণ স্থানের রমরমা মর্যাদা। ঠিক এজাতীয় অক্ষর সাজানো অন্য ভাষায় নেই। এদিক দিয়ে সংস্কৃত ভাষা অনন্য। প্রচলিত লিপি নাগরী বা দেব নাগরী—ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভুত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেমিটিক বর্ণমালার সংখ্যা যেখানে দুয়ের কোঠায়, আরমিক লিপি থেকে উদ্ভুত আরবী হরফেও যেখানে মাত্র আঠাশটি অক্ষর সেখানে উচ্চারণ স্থানভিত্তিক নাগরী বর্ণমালায় দ্বিগুণ লিপি কি করে দেখা যায়! তবে লিপির সংখ্যায় চীনকে হারানো যায় না—সেখানে একটি শব্দ একটি লিপি। শিক্ষিতদের কম পক্ষে হাজার পাঁচেক অক্ষর শিখতে হয়। চীনে সাক্ষর হওয়া সময় সাপেক্ষ, কঠিন ব্যাপার। তবে চীনের লিপি মিশরীয়দের ছবির হরফ আশ্রয় করে—চিহ্ন টেনে নয়। আর লেখাও হতো তুলিতে।

কালি কলম মন—লেখে তিনজন। কিন্তু লেখার আগে থাকে অক্ষর-শব্দাক্ষর। তেমনি সংখ্যা গোনাতেও অক্ষর এল—যেমন ওয়ান-টু-থ্রী,—এক দুই তিন। এরা কবে এল? অনেকের ধারণা শব্দাক্ষরের আগে সংখ্যার ব্যবহার আসে। তার কারণ পশুপালক মানুষকে পশুর হিসেব রাখতে চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়েছে। যতটা পশু তত লাইন টানো ;—সোজা ; তা সে লম্ব হতে পারে অথবা আনুভূমিক! যত পশু তত

লাইন ; পশুর মৃত্যু মানে একটা লাইন মুছে দেয়া ; আর পশুর জন্ম হলে একটা বেশি লাইন টানা। লাইন ॥ বা = দিয়ে এক থেকে নয় গোনার পর হাতের আঙুল ধরে দশে দম ফেলা হলো। দশে এক চিহ্ন। এই চিহ্ন কি হবে ? মেসোপটেমিয়ানরা অথবা মিশরীয়রা চিহ্ন আনলো ইচ্ছে মতন। এই ইচ্ছে মতন চিহ্নের ব্যবহার হলো সংখ্যাতে, শব্দাক্ষরের মত প্রাণ বা বস্তুর আদরা টেনে সংখ্যা হলো না। জীবনযাত্রার জটিলতা মানুষকে অসংখ্য লাইন টানা থেকে বিরত করে দশের ছকে গোনা শেখায়। আর এরই রেশ ধরে একশ বা হাজার সংখ্যারও চিহ্ন আসে। ইজিপ্টে এক থেকে 10^6 পর্যন্ত সংখ্যার জন্য আলাদা চিহ্ন ছিল ; আর লেখা হতো আমাদের মতো বাঁ থেকে ডাইনে। ওরা হাতের আঙুলের সঙ্গে মিল টেনে দশকিয়াকে মেনে নেয়। অন্যদিকে মেসোপটেমিয়ায় ছিল এক থেকে ছয়, তারপর ছয় এক, ছয় দুই ইত্যাদি। ওদের ছয় গোনার স্মৃতি আমাদের বারোমাসে, ডিগ্রির মাপে এখনো আছে। এ ছাড়া ছিল কুড়িতে গোনা। হিব্রুরা সংখ্যার জন্য অন্য অক্ষরের চিন্তা করেনা, তাদের শব্দাক্ষরকে সংখ্যা বোঝাতে আনে। একই পদ্ধতি গ্রীকদের। শব্দাক্ষর জানায় সংখ্যা। এক থেকে নয় ; দশ থেকে নব্বুই, একশ' থেকে নশ' ;—মোট সাতাশটি অক্ষর। অথচ যেহেতু গ্রীকদের শব্দাক্ষর চব্বিশটি, তাই ফিনীশিয় বর্ণমালা থেকে তারা তিনটি অক্ষর ধার করে—ফিনীশিয় ভৌ, কোপ্পা আর সাম্পি জানায় গ্রীক ছয়, নব্বুই আর নশো। রোমানরাও অক্ষর আর সোজা লম্ব রেখা নিয়ে সংখ্যা সাজায়। একেকটি বড় সংখ্যা লেখা মানে অনেক লেখা। যেমন এডল-বার্ডের বাথ 164351 লিখতে লিখলেন -. 1 × ii'j ccc.1.i —বিরাট ব্যাপার ! আর এই বাথ আরব গণিতবিদ আলখ্বারিশমীর লেখা গণিত বই অনুবাদ করে হিন্দু শূন্যকে ইউরোপে আনলেন। তাঁর বইএর নাম হলো—LIBOR ALGORISHMI DE NUMERO INDORUM—হিন্দু সংখ্যা নিয়ে আলখ্বারিশমীর নিবন্ধ। হিন্দুরাই শূন্যের প্রতিষ্ঠা করে। কবে যে হিন্দু-শূন্য ঠিক ঠাক অর্থ নিয়ে সেজে দাঁড়ায়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার

বিশপ SEVERUS SEBOKHT নয়টি চিহ্নের কথা বলেন। দশম চিহ্নের রূপ নেই—সে শূন্য। ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আলখ্বারিশমী হিন্দু-ডট বা বিন্দুকে গোলাকৃতি দিয়ে শূন্যকে আরবী ভাষায় জানালেন SIFR সিফ্‌র্‌ শব্দ দিয়ে। এই সিফ্‌র্‌ শব্দ থেকে সাইফার আর জিরো শব্দ এল। দশটি চিহ্ন দিয়ে সংখ্যা লেখার সূচনা দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘটে গেল। তারপর সংখ্যা অজস্র চিহ্ন নিয়ে গণিত বিরাট শাস্ত্র হয়ে সেজে দাঁড়ায়। দশের ভাবনা কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের আগেই ঘটে গেছে। ইলেভ্‌ন্‌ শব্দ এল স্যাক্সান শব্দ ENDLEON FAN শব্দ থেকে যার মানে দশ আর আরো এক বাকি। টুয়েলভ্‌ হলো TWELIF অর্থাৎ দুই বাকি। TEEN বা TY স্যাক্সন ভাষায় জানায় দশক। আর হানড্রেড শব্দ এল গ্রীক থেকে যার মানে দশবার দশ।

শব্দ আর সংখ্যার অক্ষর আসার পর মানুষ অযথা আর স্মৃতিকে বোঝার ভারে ভরিয়ে নেয় না। লিপির আবিষ্কারের ফলে চিন্তাভাবনা, গল্পকথা গৃহপালিত পশুর মত গোয়ালে বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের পক্ষে ভাব-বিনিময় সহজ হলো, প্রকাশও সরল হয়। লিপি তাই হাতিয়ার নয়, যন্ত্র নয়, এটি মানুষের অবয়বের অংশ। এক কথায় মনের হাতিয়ার অথবা যন্ত্র!—অক্ষর নিয়ে মানুষের ভাবনাটিকে ইউরোপীয় রীতিতে সাজান যাক!

(১০) চাকা আর চাকা

গার্হস্থ্য আগুনের সূচনা নিয়ে মানুষ অন্য প্রাণী থেকে যেমন সরে দাঁড়ায়, তেমনি অনেক হাতিয়ার যন্ত্রের ভাবনার পথে হাঁটা দেয়। আগুন পাওয়া যেত পাথরে পাথরে ঠুকে অথবা কাঠে কাঠে ঘষে। এই কাঠে ঘষার পদ্ধতিটিকে একটু সহজ সরল পথে মানুষ আনতে চাইল। তারা দেখে একটা কাঠে গোল মতো খাঁজ কেটে তার উপর একটা দণ্ড রেখে ঘুরালে কোনো কোনো কাঠ থেকে আগুন পাওয়া যায়—ঘষার চেয়ে এই রীতি সহজ। এই হলো অরণি কাঠে আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি। আর এই

অক্ষর সংখ্যা	হিব্রু অক্ষরের নাম	নামের অর্থ	গ্রীক অক্ষর	আরবী অক্ষর	গ্রীক চিহ্ন	লাতিন চিহ্ন	আধুনিক ইউরোপীয় চিহ্ন
১	আল্‌ফ্‌	ষাঁড়	আলফা	আলিফ	A	A	A
২	বেথ	বাড়ি	বেটা	বা (বে)	B	B	B
৩	গিমেল্‌	উট	গামা	জিম্‌	Γ	)	C
৪	ডালেথ্‌	বন্ধ দরজা বা ঝাঁপ	ডেল্টা	দাল্‌	D	D	D
৫	হে	জাফরি জানলা	এপসাইলন	হা	E	E	E
৬	ওয়াহ্‌	হুক, পেরেক	ভৌ°	ওয়াওহ্‌	F	F	F
৭	জা'ইন	অস্ত্র বা জলপাই	জে'টা	জা'	Z(I)	Z	Z
৮	হেথ্‌	বেড়া	এটা	হ্হা	H	B	H
৯	টেথ্‌	ঘুরণচাক	থেটা	টা	ΘH		–
১০	ইয়ড্‌	হাত	আয়োটা	ইয়া	I	I	i,j
১১	কাফ্‌	মুঠি	কাপ্পা	কাফ্‌	K	K	K
১২	লামেদ্‌	তরমুজ	লামডা	লাম্‌	Λ(L)	L	L
১৩	মেম্‌	জল	মিউ	মিম্‌	～	M	M
১৪	নুন্‌	মাছ	নিউ	নুন্‌	～	N	N
১৫	সাম্‌ক্‌	খোঁটা	ক্‌সাই	—	Ξ	–	–
১৬	আয়িন্‌	চোখ	ওমিক্রন্‌	আইন্‌	O	O	O
১৭	পে	মুখগহ্বর	পাই	ফা	Π	˥	P
১৮	সাদে	বর্শি	সামপি°	সাদ্‌	λ	–	–
১৯	কোফ্‌	ছুঁচের ফুটো	কোপ্প°	কা'ফ্‌	Q	Q	Q
২০	রেশ	মাথা	রো	রা	P	٩	R
২১	শিন/সিন	দাঁত	সিগমা	শিন/সিন	Σ	S	S
২২	তাও	...	টাও	টা	T	T	T
২৩			উপসিলন		U/V	V	u,v,w
২৪			ফাই		Φ		
২৫			সাই		Ψ		
২৬			চাই		X	X	X
২৭			ওমেগা		ω	–	–

(১) এছাড়া আরবী হরফ আছে ছা, খে, দা'ল্‌,দাদ, জ্বা' এবং গা'ইন। মোট আঠাশ অক্ষর।
(২) লাতিন অক্ষর G এবং Y আধুনিক ইউরোপীয় বর্ণমালায় আছে। লাতিন হরফ সংখ্যায় তেইশ এবং ইউরোপীয় ছাব্বিশ।
(৩) ভৌ, কোপ্প ও সাম্‌পি অক্ষরের চিহ্ন ও অক্ষর ফিনিশীয় ভাষা থেকে গ্রীকে আসে।°
(৪) কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ ভিন্ন। যেমন :-
Z জানানো হয়েছে জ'
গ ও ঘ এর মাঝে—গ'
ক ও খ এর মাঝে—ক'
দ ও ধ এর মাঝে—দ'
(৫) ব্রাহ্মী লিপি উত্তর সেমিটিক রেখা ভিত্তিক বর্ণমালাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

দণ্ড ও প্রাচীন গোল চক্র (একে চাকার আদিপুরুষ বলা যাবে) নিয়ে ভাবতে গিয়ে ধনুক-তুরপুন বা ছুতোরের ভ্রমর নামের হাতিয়ার গড়ে ওঠে। দণ্ডকে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে দুদিক থেকে টানাটানি করলে দণ্ডটি দিব্বি ঘোরে—এ জানাও মানুষের অভিজ্ঞতার পুঁজিতে হাজির হয়। অথচ তখনো ভারি জিনিস পত্র বইতে মানুষ পাথরের রোলারের মতো কিছুর সাহায্য নিচ্ছিল। মিশরের পিরামিড তৈরির পাথর বইবার জন্য রানারের নিচে রোলার-আলা ভারি স্লেড পাথরের ব্যবহারের প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। তেমনি ভাবা হয় মেসোপটেমিয়া বা অন্যত্র গাছের গোলগাল গুঁড়ি রানারের নিচে রেখে মাল বওয়া হতো। আসেরিয়ানদের পুঁথির ছবিতে এরকম গাছের রোলারের আদরা দেখা যায়।

এই গাছের রোলার হয়তো খেজুর-তাল জাতীয় গাছের কাণ্ড কেটে হতো—কারণ এখানে গোল আকার সহজে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে মাটির পাত্র গড়া শুরু হলো। আর এই মাটির পাত্র গড়তে স্থূল চরকি বা ঘূর্ণির ধারণা এল। সেই অরণি কাঠের চক্র আর দণ্ডের ভাবনা ধরে কুমোরের ঘূর্ণি গড়ে ওঠে। মেসোপটেমিয়াতে পোড়া মাটির পাত্র যেমন এল, তেমনি এখানকার সুমেরিয়ানদের হাতে সম্ভবত চাকা আর রথ পাওয়া যায়। সুমেরিয়ানরা সুদূর আর্মেনিয়া, আবেসিনিয়া, ইরান, কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল থেকে তাদের শিল্প দ্রব্যের উপকরণ বয়ে আনতো; কারণ তাদের দেশে পাথর নেই, ধাতু নেই, আছে শুধু কাদা মাটি। চক্রযানের ব্যবহার এল সুমেরিয়ানদের কাছ থেকে। তার আগে শক্ত পথে চাকা ছাড়া স্লেজ গাড়ির ব্যবহার হয়েছে, বাধা কাটাবার

জন্য কোথাও কোথাও রোলার রানার এসেছে। তবু চাকার গাড়ি হলো তৃণভূমি স্তেপের পক্ষে উপযোগী। বিজ্ঞানী স্যার লিওনার্দ উলি ১৯২৭ সালে উরের কবর থেকে দুটো চার চাকার গাড়ি আর একটা দুই চাকার রথ পেলেন—এরাই হলো প্রাচীন রথের, চক্রযানের আদিম নিদর্শন। এদের কাল হলো খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ বলা যায়, তাম্র যুগের শেষাশেষি চাকার হাজিরা।

এ ধরনের গাড়ির বিশেষত্ব ছিল। চাকাগুলো অক্ষদণ্ড বা ধুরার সঙ্গে আটকানো ছিল, যেমন কুমোরের চাক। ফলে চলার সময় এক জোড়া চাকা সমগতিতে ঘুরতো আর একটা চাকা মাটি হেঁচড়ে চলতো। এই ধরনের রথের চিহ্ন এই সেদিনেও জর্জিয়া, বাস্ক বা পর্তুগালের তরাই বা তৃণভূমি অঞ্চলে ছিল। উলির জানানো গাড়ি টানতো বলদ। আর রথ টানতো সেকালের অশ্বজাতীয় এক প্রাণী, নাম তারপান, গাধা বা বুনোগাধা—ওনেগার। ঘোড়াটানা রথ পরে এসেছে।

আগের চাকা ছিল স্থুল। পরে গরুর গাড়ির চাকার মতো চাকা এল। হিত্তাইতদের রথে সেই ফাঁপা চাকার আদল আছে। এই সময়ে মানুষ আরেকটা জিনিস দেখে—বড় বৃত্তের চাকা একটা সময়ে যতবার ঘোরে, ছোট বৃত্তের চাকা সেই সময়ে ঘোরে তার চেয়ে বেশি। বৃত্তের পরিসীমা বা ব্যাসার্ধের সঙ্গে এই ঘোরার গতির মিল আছে। কাজেই বড় চাকার সঙ্গে যদি ছোট চাকা এক টানে বাঁধা যায়, আর অক্ষ বা রাধু যদি ছোট চাকাতে আটকানো থাকে তবে গতি বাড়লেও নিয়ন্ত্রণ সহজ। দুটো চাকা

হিত্তাইতের রথ

বাঁধার ব্যাপারে এল স্পোক। এমন জ্যামিতিক ভঙ্গিতে দুটো চাকাকে স্পোক দিয়ে বাঁধা হল যে এক চাকার বল বা ফোর্স আর গতি অন্য চাকাতে সঞ্চারণ করা যায়—ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। এসব হলো অবশ্য লৌহ যুগে। পাকিলাগানো বা স্পোক-আলা গতিশীল রথের বাহন হলো ঘোড়া। হিত্তাইতরা এই রথ, ঘোড়া আর লোহার অস্ত্র নিয়ে অন্য জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্রোঞ্জের রথও এসময়ে গড়ে ওঠে। তবু লোহার অস্ত্র আর ঘোড়া নিয়ে আনুমানিক ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিকসসরা উত্তর থেকে মিশর আক্রমণ করে রাজ্য দখল করলো, আর্যরা সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস করে, আর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষী কাসাইতরা মেসোপটেমিয়া দখল করলো। আর হিত্তাইতরা সিরিয়া আর মেসোপটেমিয়ার মধ্যাংশ দখল করে নিল। এসব যুদ্ধ বিগ্রহের শেষে যারা টিকে থাকল, তারা আর্য, আসীরিয়, আর পারসীক।

লড়াই হলো তীরধনুক বর্শা নিয়ে, রথে চেপে, লোহার অস্ত্র বর্ম শিরস্ত্রাণ নিয়ে। আর এই লড়াইয়ে ধীরে ধীরে চাকার উন্নতি ঘটে। বৃত্তের পরিসীমা আর ব্যাসার্ধের আনুপাতিক চিন্তা বা π নামক রাশির কল্পনা জাগে। π-এর নানা মান কষা হয়। সব শেষে ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্কিমীদিস π-এর মানটি বলেন $\frac{22}{7}$ আর জানান দুটো বৃত্তের ঘূর্ণগতি তাদের পরিসীমার উপর নির্ভর করবে ; ব্যাসার্ধের তুলনায় পরিসীমাকে জানানো হবে πr^2। অতএব ঘূর্ণ গতির অনুপাতেআছে ব্যাসার্ধের বর্গ। এ জানার পর এক চক্র গতি থেকে অন্য চক্র গতিতে যাওয়া সহজ হয়ে গেল। হাতিয়ার থেকে পা রাখা গেল যন্ত্রে।

রথ নিয়ে যেমন স্থলপথে চলা গেল, তেমনি জলপথে যাতায়াতের জন্য নৌকো থেকে এল পাল তোলা জাহাজ। মিশরে নদীপথে যাতায়াতটা যেন জলভাত। তারা পাল তুলে উজিয়ে দক্ষিণে যেত আবার পাল নামিয়ে স্রোতে ভাঁটিয়ে ফিরে আসতো। অর্থাৎ জোয়ার-ভাঁটা আর বায়ুর দিক পরিবর্তন তাদের চোখে ধরা পড়ে। আর তাদের ভাষায় নৌকোহীন হওয়া মানে ভারি অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি বছর মিশরে উনিশে জুলাইয়ের কাছাকাছি সময়ে নদীর জল বেড়ে ওঠে। আর বানের

টান সবচেয়ে বেশি সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে। এই বন্যা আর জলের ওঠানামার হিসেব থেকে মিশরীয়রা এক পাঁজি তৈরি করে। নদীর ধারে বন্যার তোড়ে কাছাকাছি জমি ভেসে যেত, আর দূরের জমিতে জলসেচ করতে আমাদের গ্রামবাংলার মত নৌকো জাতীয় ডোঙা দিয়ে জল ঢালা হতো। মিশরে এদের বলত শাদুফ। এখনো শাদুফের ব্যবহার মিশরে আছে। আর অনেক বছর পর চাকা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আর্কিমীদিস গড়লেন হেলিকেল স্ক্রু পাম্প। তারপর নদী থেকে জল তোলা হলো পাম্প দিয়ে।

দূরে যেতে হলে জলপথই ভালো ছিল। আর স্থলপথে রথ এলেও বনেদী মানীরা ব্যবহার করতেন বারো বেহারার পালকি। এই পালকিতে চাকা জুড়ে চার ঘোড়ার বিশাল রথ তৈরি হলো তারপরে। স্থলপথে বাণিজ্য করা সহজ হয়ে গেল।

আদ্যিকাল থেকে বাণিজ্যের অর্থ হলো বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ। প্রথম বিজ্ঞানী থালীস ছিলেন বণিক; ভাবি সেয়ানা চালাক চতুর বণিক। প্রথম যুগে বিনিময়ের আদান-প্রদান ছিল শস্য—যেমন যব। যাকে বার্টার পদ্ধতি বলে তাই ছিল প্রথম যুগের বিনিময়ের ভিত্তি। পরে বড় ব্যবসায়, বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হলো রুপোর শেকেল (SHEKEL)। শেকেল হলো ওজনের একক। সোনারও শেকেল ছিল। একটি সোনার শেকেলের বদলে পাওয়া যেত আটটি রুপোর শেকেল। আর শেকেলেও ছিল চৌকো অথবা চাকার মত গোল। অর্থাৎ গতি পদ্ধতিতে চাকা ছাড়া আর গতি রইল না—সে গতি চলনদার বা বেচনদার যাই হোক না কেন। আবার টাকার সুদের হিসেবে এযুগে চক্র বৃদ্ধিহার দেখা দিল—এ সময়ে মানে গ্রীকদের কালে।··· চাকাকে বাদ দিয়ে এগুনো গেল না।

এই যুগের জাহাজের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া গেল হোমারের কাব্যে। গ্রীক-দের রথের সঙ্গে হিত্তাইতদের রথের কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তৃণভূমি অঞ্চলে বন্যপশুর ভয়ে লোকে স্থলপথে কম চলত, সমুদ্র শান্ত থাকলে যেত জাহাজে। সেই জাহাজ ছিল দৈর্ঘ্যে এগার-বার মিটার,

প্রস্থে আড়াই তিন-মিটার। জাহাজের দাঁড় ছিল ওক কাঠের, তক্তা-পাটাতন পাইন কাঠের। নৌকোর দাঁড়ায় একটা গর্তে মাস্তুল বসানো হতো আর মাস্তুলের দুপাশে টানা দেয়া থাকত। পাল তৈরি হতো রেশমি কাপড়ের—চৌকো বর্গাকার পাল! গরুর চামড়ার রশি দিয়ে পাল তোলা হতো, টানা দেয়া হতো। এই জাহাজ জলে ভাসতো—কেন ভাসতো—সে নিয়ে সে যুগের মানুষের ভাবনা ছিল না। সেই ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে ২৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, আর্কিমীদিসের হাতে। তিনি জানালেন জলে ভাসার তত্ত্ব।

নতুন জাহাজের নক্‌শার তত্ত্বে যেমন আর্কিমীদিসের নিয়ম এল, তেমনি এল গোলা বর্ষণের ফলে জাহাজ যাতে চটকরে ডুবে না যায় তা নিয়ে ভাবনা। কেননা তখন বারুদকেও মানুষ বাগ মানিয়েছে।

(১১) চীনে পটকা

চীনেদের কাছ থেকে তিনটি জিনিস পাওয়া গেল—মুদ্রণ পদ্ধতি, বারুদ আর কম্পাস। চৈনিক সংস্কৃতিতে মুদ্রণ কোনো বিপ্লব আনতে পারলো না, কারণ তাদের হাজার হাজার অক্ষরের চিত্র; কাজেই বর্ণ ঢালাই করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। আর কম্পাস চীনেরা তৈরি করে বলে অনুমান করলেও, লোড স্টোনের ধারণা সেই আদিকাল থেকে মানুষের জানা ছিল। থালীস জানতো লোডস্টোনের আত্মা আছে—আত্মা লোহাকে টেনে ধরে। রোমান কবি লুক্রেশিয়ান লিখলেন তামার পাত্র ভরা লোহার চুর্ণ রেখে তার উপর দিয়ে লোডস্টোন নাড়াচারা করলে লোহার গুঁড়ো ফুটন্ত জলের মত ছটফট করে। আর পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে হিপ্পোর সেন্ট অগস্টিন লোডস্টোনের ব্যবহার দেখে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন—কী আশ্চর্য ব্যাপার, লোডস্টোনের গায়ে এক আংটা লাগালে পর পর তারা অন্য আংটা জুড়ে পড়তে পারে শিকল—অথচ কোন বাঁধন নেই! এবং ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ইস্পাত বা লোহাকে লোডস্টোন ঘষে চুম্বক করা গেল।

তার আগে আকাশের নক্ষত্রের অবস্থান মাপার জন্য গ্রীকরা এক যন্ত্র করেছিল—যাকে চতুর্দশ শতাব্দীতে বলা হতো আস্ত্রোলাবে (ASTROLABE)। গ্রীকরা পরিশ্রমী ছিল না, তথ্য সংগ্রহে অনীহা ছিল। অথচ অন্যের জানা-খোঁজা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করে তত্ত্ব তৈরি করতে পারতো। তারা অঙ্ক নামের ভাষার হাতিয়ার তৈরি করে ; তবু যন্ত্রপাতি দিয়ে আকাশ দেখা, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা—ওটা গ্রীকদের আসতো না। সেই গ্রীকরা এই আস্ত্রোলাবে যন্ত্রটা করে বলে জানা যায়। এই যন্ত্রে তারকার অবস্থান মাপতে অনেক ভুল। তবু এই যন্ত্র জাহাজ চালাতে লাগল। মজা হলো, এক এক ল্যাটিচুডে, মাপের জন্য যে চাকতি আছে, যাতে থাকে দিক নির্দেশনা আর চাকতিতে থাকে স্কেল,—চাকতির বদল হবে। দিক মাপার জন্য এই আস্ত্রোলাবেতেই প্রথম কাঁটার ব্যবহার এল। এই যন্ত্র নিয়ে ১৬০০ সাল পর্যন্ত জ্যোতিবিদরা আকাশ দেখলেন ; তবে তাদের যন্ত্র গ্রীকদের উন্নত সংস্করণ, সেখানে ভুল ত্রুটি কম।

জাহাজ চালানোর ব্যাপারে এই কাঁটা আনা হলো। কাঁটা হলো চুম্বক কাঁটা। এক কলসি জলে খড়ের উপর এই কাঁটা ভাসিয়ে রাখা হতো—জানা যেত উত্তর-দক্ষিণ দিক। এই কম্পাস নিয়ে নাবিকরা তিনটে জিনিসের সন্ধান পেল—তার দিক, তার অবস্থান, আর জাহাজ ভিড়িয়ে নেবার মত জায়গা। চীনেদের জানানো খড়ে ভাষানো কম্পাসের উন্নতি ঘটে ইতালীতে—আমালফি অঞ্চলে, ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। যা হোক প্রকৃত মেরু থেকে যে এই কম্পাসের মেরুতে ফারাক আছে, সেই সমস্যা থেকে গেল। স্বয়ং কলম্বাস দেখলেন চুম্বক কম্পাস ঠিক উত্তর-দক্ষিণ দেখায় না—বিশেষ করে জাহাজ যখন পূব থেকে পশ্চিমে যায়। এই সময় হয় কলম্বাস, নয় ক্যাবট বলে আরেক জন নাবিক ধ্রুব নক্ষত্র দেখে কি করে চুম্বকের সাহায্যে দিক স্থির করা যায় তা আবিষ্কার করলেন। ইতিমধ্যে আরবরা আস্ত্রোলাবের একটা উন্নত সংস্করণ করেছিল—যার সাহায্যে দ্বিপ্রহরে সূর্যের অবস্থান পরিমাপ করে অক্ষাংশ স্থির করা যেত ! অর্থাৎ এর মানে ঘড়ির ব্যবহার। ঠিক ঠিক কম্পাস পাবার আগে অবশ্য ঘড়ি

এসেছে—সেটা ১৫০০ সালে। আর কম্পাসের গোলমাল কেন যে ঘটে তা জানালেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত গ্রীশম কলেজের ছাত্র ও সাময়িক অধ্যাপক এবং পেশায় চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট।

ঠিক ১৬০০ সালে লাতিন ভাষায় গিলবার্ট এক বই লেখেন, সেখানেই জানালেন যে এই পৃথিবী নিজেই এক বিরাট চুম্বক। আর এই ভাবনার প্রমাণে তিনি লোডস্টোনের এক গ্লোব তৈরি করলেন, নাম দিলেন (TERRELDA) বা ছোট পৃথিবী। এর আগে হিপ্পোর সেণ্ট অগস্টিন একটা ছোট চুম্বকপাথরের গোলা করেছিলেন, তাকে আদর করে ডাকতেন টেরা-পৃথিবী। বাস ঐ পর্যন্ত। গিলবার্ট কিন্তু তার ছোট পৃথিবীর উপর পাতলা লোহার তার, কম্পাসের নিডল বসিয়ে বসিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন নাবিকরা কম্পাসে যে গোলমাল দেখেছিল—সেই গোলমাল এখানেও দেখা যায়। অতএব পৃথিবী নামক চুম্বক বস্তুটি অন্য চুম্বকের ধর্মে গোলোযোগ ঘটায়। এরপর সত্যিকারের কম্পাস গড়া সহজ হলো—তবে তা ১৬০০ সালের পর।

অন্য দিকে বারুদের আবিষ্কার চীনে হলেও সেটি তখন হাউই আর পটকার মত ফসফস করে পুড়তো বলে, বাজির বাজারেই ছড়িয়ে ছিল। ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের রোজার বেকন বারুদের সঠিক সূত্র বার করেন—তিনি চীনেদের গন্ধক আর অঙ্গারের সঙ্গে সোরা মিশিয়ে দিলেন, অনুপাতটাও ঠিক করলেন। বারুদের বিস্ফোরক শক্তি মানুষের হাতে এল।

লৌহ যুগের আগে মানুষ তিনটি জিনিস পেয়েছিল,—ঘোড়া, বর্ণমালা আর মুদ্রা। আর ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে তিনটি জিনিস মানুষের অগ্রগতিতে বিপ্লব আনলো ; তারা হলো—জাহাজ, ছাপাখানা আর ব্যাঙ্ক। কামান সমেত জাহাজ তৈরি করতে গিয়ে জানা গেল, জাহাজের সেণ্টার অফ গ্র্যাভিটি থাকবে জলের তলায়। আর্কিমীদিসের জলে ভাসা তত্ত্বের সঙ্গে যোগ দিল সেণ্টার অফ গ্র্যাভিটি। আর ছাপাখানা আসায় লেখাপড়া সহজ হয়ে দাঁড়ায়—জ্ঞানের বিনিময় ঘটে।

লোহার জন্য চুল্লির উন্নতি, জলশক্তি আর বিদ্যুৎ শক্তিকে বশে আনার

দ্বারে ১৬০০ সালে মানুষ পৌঁছে যায়। তার আগে পুরনো ভাবনা নিয়ে আরেকবার মাথাব্যাথা শুরু হয়।

চীনেরা তুটো যন্ত্র করেছিল—একটা হলো ভূকম্পন যন্ত্র বা এখানকার সিসমোগ্রাফের আদি রূপ। তুশো খ্রীষ্টাব্দে এই যন্ত্র তৈরি হলো। একটা পাত্রের কানায় অনেকগুলো অনেক দিকে গর্ত ; গর্তে আছে লোহার বল—হালকাভাবে ধরা। ভূমিকম্পন হলে পাত্রটি কাঁপে, লোহার বল নিচে রাখা পাত্রে পড়ে—ঘণ্টার আওয়াজ ওঠে। এই যন্ত্রে কোন্ দিকে যে কম্পন তা জানা গেলেও, কম্পনের শক্তি মাপা যায় না। তবু এই-হলো আদি সিসমোগ্রাফ—যেখানে সামান্য কম্পনে বল পাত্র থেকে পড়ে—ব্যালেন্সের অদ্ভুত খেলাটা চীনেরা দেখাল।

দ্বিতীয় যন্ত্র হলো এমন যন্ত্র যা সমগতি নিয়ে চলে—যাকে বলা হবে এসকেপমেন্ট মেকানিজম। এর আবিষ্কার ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এই যন্ত্রে আছে গিয়ার, পুলি, পিনিয়ন ইত্যাদি যা ঘড়ির যন্ত্রে পাওয়া যায়। আদি চাকার রূপে ব্রোঞ্জের ঢালাইয়ে দাঁত-আলা পিনিয়ন-গিয়ার হতে পারে—হলোও। ঠিক করে থেকে যে চাকা থেকে পিনিয়ন-দাঁত এসেছে তার হদিস নেই। তবে সাত শতকে এর ব্যবহার দেখে মনে হয়, এরা এসেছে অন্তত পাঁচশ বছর আগে—তা না হলে এত যত্নে,এত সুন্দর করে এই ব্যবহার করা যেত না।

এই সাতশতকে চীনেরা দিল ভাসমান চুম্বক। এদের যাতুকররা অবশ্য এর আগে ১০০ খ্রীষ্টাব্দে চুম্বকের চামচ ব্যবহার করে দর্শকদের ভড়কি খাইয়েছে।

চীনেদের বারুদ, পিনিয়ন, ব্যালেন্সের খেলা, আর মুদ্রণ শিল্প মানুষকে তুমকরে ধাক্কা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে দিল। আর তখন মানুষ শক্তি নিয়ে ভাবতে বসে।

ধাতুর ব্যবহার মানুষ জানলো, চুল্লির উন্নতিও হলো। কামারশালার হাপর থেকে চুল্লিতে এল বায়ু বা এয়ার পাম্প। বায়ু আর জলশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সহজে অনায়াসে নানাকাজে মানুষ হাত দিতে পারে। তাছাড়া ঘোড়াতো ছিল, যাকে বলা যাবে হর্সপাওয়ার বা অশ্বশক্তি। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ধার্মিক বৌদ্ধরা খাড়া দণ্ডযুক্ত প্রার্থনাচক্রের প্রবর্তন করলো—সেই ধর্মচক্র তিব্বতে-ভুটানে এখনো চলে আসছে। এই প্রার্থনাচক্রের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে পারসীকরা ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বায়ু চালিত মিল বা হাওয়াই যন্ত্র তৈরি করে শস্য ভাঙতে শুরু করল। ধর্মের চাকা হাওয়ায় নড়তো—এবার সেই হাওয়াতে ঘোরানো চাকা শষ্য পেষাইয়ের কাজে লাগানো হলো। তবে পারসীকদের হাওয়া কলের একটা সীমা ছিল—হাওয়ার দিক পরিবর্তন হলে কল চলবে না। সর্বত্র সাধারণ ভাবে ব্যবহার যোগ্য হাওয়া কল সম্ভবত আরবরা তৈরি করে—তিনকোনা পাল খাটানো বায়ু যন্ত্র ক্রুসেডাররা ইউরোপে আনলো। এই মিলের বিশেষত্ব হলো পাল খাটানো দণ্ডটার মুখ যে দিকে বায়ুর প্রবাহ সেদিকে ঘুরিয়ে দিলেই চলে। ডন কুইকজোট তারপর বর্শাহাতে এই মিলের সঙ্গে লড়াই করতে নামে, আর ডাচরা সমুদ্রতলের চেয়ে নিচু জায়গা থেকে পাম্প করে জল তুলে সেই ভূমিতে চাষবাস করে। হিরোর উইণ্ডমিল ইংলণ্ডেও জমি উদ্ধারের কাজে লাগলো।
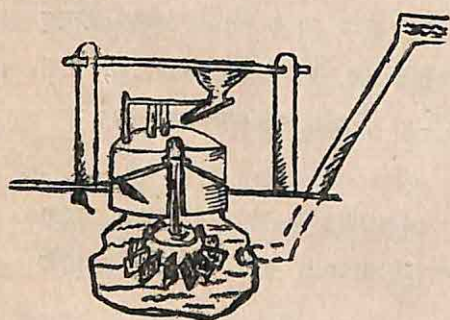
টারবাইন পাম্প

জলশক্তিকেও কাজে লাগানো হলো। জলস্রোতে ঘোরানো চাকা হিরোর কাল থেকে অনেকপথ এগিয়ে এসে আরবদের হাতে আসে।

শস্যভাঙতে, কাগজ তৈরি করতে জলের স্রোতে চালানো চাকা আরবরা আকছার ব্যবহার করে এসেছে। এসব মিলে দাঁত-আলা কাঠের বা ধাতুর চাকা ব্যবহার হলো। এই জলশক্তির হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, জলের স্রোতে চাকা ঘোরে, এই চাকা ঘোরায় একটা আনুভূমিক দণ্ড—যেমন কুমোরের চাক! গিয়ার এই গতিকে খাড়া দণ্ডে সঞ্চারিত করে,···আবার ঐ দণ্ড ঘোরায় একটি পাথরকে আরেকটি পাথরের উপর—যেন জাঁতা। লৌহযুগে প্রাচীনজগতে একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হলো—যন্ত্রটা হলো খাড়া দণ্ড বা টারবাইন যুক্ত জলযন্ত্র। আর্কিমীদিসের হেলিকেল পাম্প থেকে টারবাইন যন্ত্রের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা—তবে এখানেও কোনো গিয়ার এই। কাজেই এফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা ছিল বেশি। মোগল ইতিহাসে জানা যায়, বাদশা আলমগীরের আমলে বাগানের নালা থেকে যে জল আসতো,সেই জলে এই টারবাইন যন্ত্র চালিয়ে এক আটাপেষা-আলা রুজিরোজগার চালাতো। যেমন সব যুগে হয়ে থাকে, তেমনি রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে বিবাদ হওয়ায় তারা নালা দিয়ে জল পাঠানো বন্ধ করে—আটা-আলার রুজি বন্ধ। কোনোরকমে সে আলমগীরের সাথে দেখা করে তার আর্জি পেশ করে! সরেজমিনে তদন্তে এসে বাদশা তো কল দেখে ভারি অবাক। তাঁর আদেশে আবার জল নালায় বয়—রুটি-আলার রোজগার ঘটে।···এই যন্ত্র, শোনা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে আর বল্কান দেশে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের প্রাক্কালেও চলেছিল। আর্কিমীদিসের পাম্প সেচের কাজে লাগল আর টারবাইন যন্ত্র লাগল সেচের নালার ধারা বা যে কোনো জল-স্রোতকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টায়।

এই টারবাইন যন্ত্রের উন্নতি ঘটে—উইণ্ডমিলের গঠনে এদের দেখা যায়। পূর্ব ইরান আর আফগানিস্থানের গ্রামে এই যন্ত্র এখনো দেখা যায়—যেখানে একদিক থেকে হাওয়া সারা বছর বয়—সেইখানে খাড়াদণ্ডের সঙ্গে বাতাসে খেলে এমন হালকা ধাতুর পাতা, বা ব্লেডের তৈরি চাকা থাকে। একদিকে মাটির দেয়াল তুলে এলেমেলো বাতাসের গতি আটকানো হলো—পাওয়া গেল জলযন্ত্রের মতো বায়ুযন্ত্র।

এইসব উইণ্ডমিল বা ওয়াটার মিল বা মেসিনারির ভাবনা থেকে ব্যবহারিক নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায়—জানা যায় ফোর্স,—যান্ত্রিক গতি সম্পর্কে ইঙ্গিত। এই গিয়ার আর পিনিয়নের ভাবনার সঙ্গে ফোর্সের পরিচলনের ভাবনা আসে। দুটো কাঠের রোলারকে একটা চামড়ার বেল্টে বেঁধে একটা ঘুরালে অন্যটা যে ঘোরে এই ভাবনা প্রাগৈতিহাসিক। গিয়ার-পিনিয়নের চিন্তা এল সেই সাথে—হয়তো বা চীনেদের হাতঘুরে অন্য দেশে। কিন্তু সাইকেলের চেন-লিঙ্ক—তার সঠিক ধারণা করলেন একজন মহান চিত্রশিল্পী—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। তিনি গ্রীক লাতিন ভাষা জানতেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। তবু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছবি আঁকা আর ইঞ্জিনিয়ারিং—দুটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করলেন। ভারের ফলে লোহার বা ধাতুর বারে (BAR) কি ধরনের বিকৃতি ঘটে—যাকে বলা হয় স্ট্রেস বা স্ট্রেন, তা দেখে আঁকলেন, নোট লিখলেন। পাখির ডানার গঠন তন্ন তন্ন করে দেখলেন, আঁকলেন আর ভাবলেন প্যারাসুট গড়ার রীতি। আর্কিমীদিসের নিয়ম আর হিরোর যন্ত্র নিয়ে ভেবে, সে যুগের নানা চিন্তা ভাবনার শৈল্পিক কাঠামোতে যান্ত্রিক বোধ আনলেন। যেমন আঁকলেন মোনালিসার মত সুন্দর ছবি, তেমনি শিল্প আর যন্ত্র নিয়ে চেন-লিঙ্কের সূচনা করলেন। তাঁর আঁকা চেন-লিঙ্কের স্কেচ আজো আমাদের বিস্ময় করে—কত পরিণত সেই চিন্তা। মোনালিসার ছবি থেকে এই স্কেচ কোনো অংশে খাটো নয়। মনন ও বোধির সমন্বয়ে তিনি যন্ত্র-বিজ্ঞান-আর্কিটেকচার-পেন্টিং সবকিছুকে একসূত্রে বেঁধে থালীস থেকে হিরো এই সাতশ বছরের গ্রীক চিন্তার সমন্বয়ের একটি মাত্র উদাহরণ-নির্দেশনা হয়ে দাঁড়ালেন। অনন্য অসাধারণ এই দ্য ভিঞ্চি!
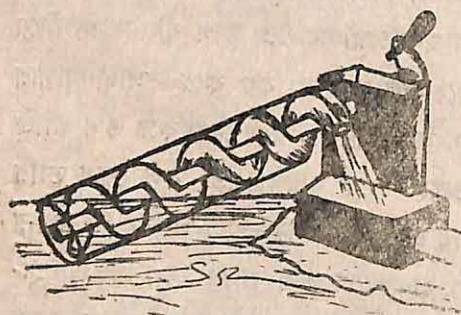
হেলিকেল পেনিয়ন

যন্ত্রও যে শিল্প একথা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জানলেন বলেই যন্ত্র বিপ্লবকে কি শিল্প বিপ্লব বলা হয় ?···সেই সময়ে যন্ত্র যেন শিল্প হয়ে ওঠে।

আর সময়ের মাপ নিয়ে ভাবনার শেষ হয় তখন।

মেসোপটেমিয়া-ইজিপ্টে ছিল সূর্য ঘড়ি। সূর্যের ছায়া মেপে দিনের সময় ঠিক হতো। থালীস গ্রীসে সেই ঘড়ি আনেন। তবে সূর্যঘড়ির সঠিক নিয়ম দেন আনেক্সিমান্দের। এছাড়া ছিল জলঘড়ি—কারণ রাত্রে সূর্য নেই, ছায়া নেই ; মেঘলা দিনেও সূর্যের মুখ দেখা ভার। জলঘড়ির আলোচনায় প্রাচীনরা দেখেন জল পড়ার ধারা নির্ভর করে পাত্রের আকারের উপর—তারা কনিক্যাল বালতির কথা ভাবলেন। তবু জলের ধারা নির্ভর করে তাপের উপর, জলের নোংরা-মুক্ত হবার উপর —ভিস্কসিটির উপর। এছাড়া ছিল বালি ঘড়ি। এই ঘড়ির ব্যাপক ব্যবহার হলো বক্তৃতা থামাতে—কারণ সে যুগে মানে দ্বাদশ ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে, যাজকরা বক্তৃতা দিতে উঠলে তাদের থামানো যেত না। একটা মজার ছবি আছে। সেন্ট এণ্ড্রুস চার্চের যাজক জন নক্স হাত পা ছুঁড়ে বিশাল মুখ হাঁ করে চোখ গোলগোল করে বক্তৃতা দিচ্ছেন—সামনে রাখা বালুঘড়ি আর সেদিকে তাকিয়ে আছেন বিশপ আর অন্যান্য যাজকরা। কেন যে—তার কারণটা জানা নেই। হয়তো নক্স বক্তৃতা থামালে তারা বলার কখন সুযোগ পাবে সে দিকেই জুলজুল চোখে তারা তাকিয়ে আছেন !

১২৫০ সালের কাছাকাছি একজন অজানা মানুষ তৈরি করলেন মেকানিকাল ক্লক। সেই চীনেদের এসকেপমেণ্ট যন্ত্রের মত 'গিয়ার-পিনিয়নে গড়া একটা ফোলিয়ট (FOLIOT) বা আনুভূমিক ভারি দণ্ড বা রিঙ—পেণ্ডুলামের আদিরূপ একে বলা যায়। ফোলিয়ট নড়ে চড়ে—গিয়ারের দাঁত এক ঘর যায়। এ জাতীয় সবচেয়ে ভাল ঘড়ি দিনে বিশ-থেকে পঁচিশ মিনিট ফাস্ট-স্লো যেত। এদিয়ে এরা এলার্ম ক্লকও তৈরি করলেন। ভোরবেলা ধর্মীয় মঠের লোকদের ঘুম ভাঙাতো এই ক্লক বা ঘড়ি।

১৫৮০ সালের কাছাকাছি গালিলিও গালিলি গির্জায় বাতিদানের দোলন দেখে পেণ্ডুলামের তত্ত্ব জানলেন। শোনা যায় নিজের নাড়ি ধরে তিনি পেণ্ডুলামের সময় মাপলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এতসব আঁকুপাঁকু অবস্থা-তেও গালিলিওর নাড়ির গতি ঠিক নিশ্চয় ছিল—নইলে সঠিক নিয়ম পেলেন কি করে?
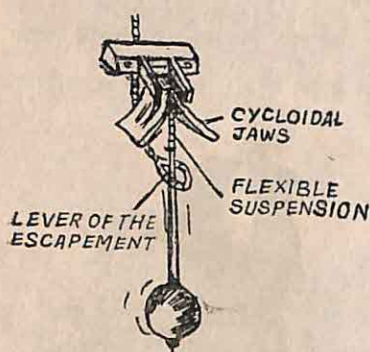
তবে গতিশাস্ত্রের নিয়মের পরীক্ষাতে যখন গালিলিও নামলেন, তিনি তখন জলঘড়ি ব্যবহার করলেন—এবং জানলেন নিচে নামার গতিবেগে সময়ের বর্গ কাজে নামে। অর্থাৎ দূরত্বকে সময়ের বর্গ দিয়ে ভাগ করলে এক উত্তর পাওয়া যাবে।

সময় মাপতে পেণ্ডুলামের ব্যবহার গালিলিও জানালেন ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে। আর পেণ্ডুলামের সময়ের হেরফের কেন ঘটে এটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স জানলেন বিষুব বৃত্তের কাছে পৃথিবী খানিকটা ফুলে ওঠে; আর তিনি জানালেন স্পাইরেল ওয়াচস্প্রিঙের তত্ত্ব। তবে সে তো ১৬০০ সালের পরের কথা, কারণ হাইগেন্সের জন্মই তো ১৪ই এপ্রিল ১৬২৯ সালে! ১৬০০ সালের আগে পেণ্ডুলামের ঘড়ি নিয়ে, আধখেঁচরা নিয়ম নিয়ে মানুষ যন্ত্রযুগে এল। যন্ত্রযুগের সঠিক নিয়ম

জানালেন গালিলিও, রবার্ট হুক, ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স, রবার্ট বয়েল এবং নিউটন। এঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

(১৩) তারপর

সাড়ে সাত লাখ বছর ধরে পৃথিবীর পথ হেঁটে ক্লান্ত মানুষ ১৬০০ সালের দ্বারে এল। এবার তারা চাইল যন্ত্র দিয়ে পরিশ্রম লাঘব করতে, এবং যে অভিজ্ঞতার ঝুলি তাদের হাতে এসেছে তাদের ঝাড়াই বাছাই করে নিয়ম খুঁজতে। এর জন্য, নিয়ম খোঁজার জন্য, তারা মুখের ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষাতে হাত বাড়ালো—তা হলো অঙ্ক। তাছাড়া দ্য ভিঞ্চি দিয়েছেন ছবি। অতএব ইঞ্জিনিয়ারিং বা যন্ত্রের ভাষা দুটো—অঙ্ক আর ছবি। অঙ্ক নিয়ে ভাবনা আর ছবি দিয়ে বোঝানো।...আর একবার যন্ত্র হাতে পেয়ে মানুষ যেন আরো অলস হয়ে দাঁড়ায়—শরীর দিয়ে কাজ করতে আর চায় না। কিন্তু খোঁজার পথে পরিশ্রম করতে আপত্তি নেই।

মেসোপটেমিয়ার লোকেরা কাঁচ পেয়েছিল—সে কবে? তাম্র যুগের আগে! সেই কাঁচ ঘষে কবে লেন্স পেল তা জানা নেই। তবে লেন্স দিয়ে সূর্যের তাপ এক বিন্দুতে যে আনা যায় তা গ্রীকদের কালে জানা ছিল—আর্কিমীদিস সেই পথে রোমান জাহাজ পোড়ালেন। লেন্স দিয়ে যে দূরের জিনিস কাছে দেখা যায় সে ধারণাটা কবে যে এল তার কোন হদিশ জানা নেই। ডেনিসরা প্রথম টেলিস্কোপ তৈরি করে; আর সেই টেলিস্কোপের সুদর্শনে রূপ দেন টাইকো ব্রাহে। ১৬০৯ সালে গালিলিও সে খবর শুনে নিজেও এক টেলিস্কোপ তৈরি করলেন। তবে ব্রাহেদের টেলিস্কোপ হলো ১৬০০ সালের আগে। তাই দিয়ে তিনি আকাশ দেখলেন, নক্ষত্রপঞ্জি তৈরি করলেন, আর তাঁর সহযোগী কেপলের সেই সব তথ্য থেকে জানালেন গ্রহদের পথ উপবৃত্তাকার—ইলিপ্স। সেও হলো ১৬০৯ সালে। কেপলের নিজেও একটি টেলিস্কোপ করেন—তবে আরো কিছু পরে। আর তিনি দেন লেন্সের নিয়ম।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আবিষ্কার। আন্তন ভান লী ভেনহোক

ছোটকে লেন্স দিয়ে বড় দেখার যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, তারই ধারায় রবার্ট হুক তৈরি করেন মাইক্রোস্কোপ। তবে কেপলের ও রোজার বেকন লেন্স তত্ত্বের সূচনাটি করেন ১৬০০ সালের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। তারপর তো সব কিছু নিউটনের আওতায়।

এই ষোড়শ শতকের আর একটি বড় আবিষ্কার হলো ব্যারন নেপিয়ার লগারিথম আবিষ্কার করেন, ব্রিগস তার উন্নতি ঘটাল। আর সেই পথ ধরে আর কিছু পরে ১৬২২ সালে আউট্রেড (OUGHTRED) তৈরি করেন স্লাইড রুল—যা ইঞ্জিনিয়ারদের হাতের স্বয়ংক্রিয় গণনার যন্ত্র হয়ে সেদিনেও ছিল ;—ক্যালকুলেটার এসে অবশ্য একে হঠিয়ে দিচ্ছে।

আর তৈরি হলো মাইনিং মেসিনারি। ১৫৫৩ সালে আগ্রিকোলা (AGRICOLA) মাইনিং পাম্পের তত্ত্ব জানালেন—এমনকি ২০০ মিটার গভীর খনি থেকে নানা স্টেজের পাম্প বসিয়ে জল তোলার খবর জানা গেল। এই সময়ে মাগডেবার্গের অটো ফন গুএরিক (OTTO VON GUERICKE) বায়ু শূন্যতার কথা ভাবলেন—তৈরি করলেন এয়ার পাম্প। এই সব মিলিয়ে জুলিয়ে ১৫৪০ সালে ইটালির ভান্নোচ্চিও বিরিগুচ্চিও (VANNOCCIO BIRIGUCCIO) আধুনিক রিভার-বিরেটরি ফার্নেসের দ্বারে এসে গেলেন। লোহার ঢালই সহজ হলো। আর জানা গেল কি করে আগুনের শিখার রঙ দেখে তাপ ঠিক করা যায়।

এই সব খনিবিদ, ধাতুবিদ আর যন্ত্রবিদের দল হাত ধরাধরি করে এমন দ্রুত এগিয়ে চলে যে প্রচলিত বিজ্ঞানের ধারণায় চিড় ধরে। জ্যোতিষ আর ম্যাজিকের হাত থেকে মনের মুক্তি ঘটে। অনেক তথ্য জোগাড় হয়। অনেক কিছু মানুষ গড়ে তোলে—যার কারণটা জানা মানুষের মাথাব্যাথার কারণ হয়। আর অনেক কিছুর দিকে মানুষ হাত বাড়াতে গিয়ে হাতিয়ার ছেড়ে যন্ত্রকে ডাকতে চায়।

এই সময়ে যন্ত্রের যুগে পা রাখার অন্য কারণ হলো ১৫৪৩ সালে আরবি ভাষা থেকে তারতাগলিয়া (TARTAGLIA) আর্কিমীদিসের বইয়ের অনুবাদ লাতিন ভাষায় করলেন। ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে যন্ত্র যুগের শুরু

আর্কিমীদিস করেছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে যন্ত্রবিদরা তাকে জানতে পেয়ে আনন্দে ছটফট করে জোর কদমে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পেলেন।

আর তারা জানলেন হিরোকে।

প্রথম অটোমেটিক মেসিন করেন হিরো—মন্দিরের দরজা খোলার তত্ত্ব নয়। এ হলো প্রথম স্লটমেসিন।—যেমন ওজন মাপের যন্ত্রে দাঁড়িয়ে গর্তে টাকা ফেললে ওজন লেখা টিকিট পাওয়া যায়—তেমনি এক স্লট মেসিন করেন হিরো। একটা গর্তে সে যুগের ভারি সোনা-রূপার মুদ্রা নির্দিষ্ট মানের ফেললে পবিত্র পূতবারি আপনা থেকে ঝরে পড়ে। মুদ্রাটি কিন্তু নির্দিষ্টমানের অর্থাৎ ওজনের হওয়া চাই। ব্যাপারটা হলো একটা পাত্রে জল আছে সেখানে ডোবানো আছে একটা হাতা। হাতার উলটোদিকে একই দণ্ডে বাঁধা আছে একটা চাকতি—দণ্ডটা একটা ফাল-ক্রামে এমন ভাবে বসানো যে চাকতির উপর স্লট মেসিনের গর্ত দিয়ে নির্দিষ্ট ওজন ফেললে জল ভর্তি হাতা উপরে ওঠে—ওদিকে চাকতিটা ওজনে নিচে নামে বলে টাকাটা নিচে পড়ে; হাতার জল বাইরে আসে, আর লিভারের ফাংশন অনুযায়ী হাতা আবার জলপাত্রে নামে। আর্কিমীদিসের লিভারের তত্ত্বের ব্যবহারিক ফলিত রূপ দিলেন হিরো।...

যন্ত্র মানে তবে কি ম্যাজিক, পয়সা রোজগারের ফন্দি ফিকির? তা নয়। যন্ত্র হলো মানুষের সহকারী, মানুষের অনুসন্ধিৎসার পথের যষ্টি, তথ্য জোগার করার হাতিয়ার, তথ্য প্রমাণ করার সহযোগী। যন্ত্রকে ভুল পথে চালিয়ে মানুষের রুজি রোজগার শক্তি-ক্ষমতা বাড়তে পারে; সে যন্ত্র তখন যন্ত্রণা।

হিরোর ফন্দি ফিকির যেদিন ধরা পড়ে, তখন হিরো অবশ্য বেঁচে নেই, সেদিন ক্রুদ্ধ জনতা পুরোহিতদের পিটিয়ে মেরে ফেলে, হিরোর মেয়েকেও রেয়াৎ করে না।

মানুষ চায় না যন্ত্র ভুল পথে যাক। সেই চাওয়াতেই মানুষ—মানুষ হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন সভ্যতার সূচনায় মানুষ হাতিয়ার, জাহাজ-বসতবাটি, অথবা খেত-

খামার গড়তে গাছ কাটতে থাকে। ভূমি যত বৃক্ষ শূন্য হয়, অঙ্গার দুষ্প্রাপ্য হয়, আর পরিবর্তন হয় জলবায়ুর। প্লাতো খ্রীষ্টপূর্বাব্দ চারশতকে এটিকার জলবায়ু আর ভূদৃশ্যের পরিবর্তন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে লিখলেন, 'তৃণপূর্ণ মাঠ, স্থায়ী ঝরণা আর আরণ্য উপত্যকা ভরা দেশ একটা সাদা চুনাপাথরের কঙ্কালে রূপান্তরিত হলো, কেবল তার গর্তে গর্তে একটু মাটি।' এই দেখাও তো যন্ত্রযুগের বিষময় ফলে মানুষ দেখছে—যন্ত্রের ধোঁয়ায় প্রকৃতি বদলায়, আবহাওয়া বিষাক্ত হয়, নদীর জল দূষিত হয়। প্লাতোর দেখা থেকে এ দেখাতে কোনো ফারাক নেই।

মানুষ যা দেখেছে তা দেখেছে আদ্যিকালে, হাতিয়ার তৈরির কালে। তারপর শুরু হলো সেই দেখাকে বুঝতে চাওয়া—আরো বিশদ ভাবে, আরো অনুপুঙ্খরূপে দেখা। দেখার যন্ত্রণা মানুষকে যন্ত্র জুগিয়ে দেয়।

লাঠি হাতে মানুষ দাঁড়ায়, প্রকৃতির রাজ্যে নবীনতম শিশু—বামনাবতার সে। তার শখ তিনভুবনকে জয় করার। সেই ইচ্ছায় সে কুড়াল হাতে পরশুরাম হয়, তীরধনুক নিয়ে হয় রাম আর লাঙল কাঁধে বলরাম। তার সব ইচ্ছার শেষে সে পূর্ণাবতার রূপ পায় চক্রধারী কৃষ্ণ হয়ে। চাকা হাতে নিয়ে মানুষ বিশ্বরূপ দেখতে ছোটে, আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনার সারথি হয়ে সাক্ষী হয়। সেখানে সে থামে না। বিশ্বরূপ দ্রষ্টা মানুষ বিশ্বরূপের সামিল হতে চায় বলে সে যন্ত্রকে হাতে নেয়। কারণ যন্ত্র তার সে পথে যাবার রথ, তার তথ্য থেকে তত্ত্ব গড়ার পথ।

সেই পথে রথ যাত্রার শুরু ১৬০০ সালের পর—সপ্তদশ শতকে।

———